
Anjali
2026



HEARTIEST FELICITATIONS ON DURGA MATA POOJA CELEBRATIONS

ICIJ
ESTB. 1921

一般社団法人 在日インド商工協会

THE INDIAN COMMERCE AND INDUSTRY ASSOCIATION JAPAN

MORE THAN 100 YEARS OF DEDICATED SERVICE

Established in 1921, ICIJ is the oldest association representing the Indian diaspora in Japan. Its membership includes several of the largest corporate groups operating in the region. As the apex body, ICIJ plays a leading role in organizing India-related trade fairs, exhibitions, seminars and symposia. The organization also hosts dynamic monthly seminars focused on a wide range of topics, including India-Japan startups, global investment opportunities, finance, mergers and acquisitions, wealth management, taxation, visa regulations and Japan's labor and legal systems.

To support the next generation, ICIJ has established a dedicated Youth Group for young Indian residents in Japan. Additionally, ICIJ has signed a comprehensive cooperation agreement wilh the Edogawa City Office and the Tokyo Chamber of Commerce, Edogawa Chapter.

President: Mr Jagmohan Chandrani, **Chairman:** Mr Ryuko Hira,
Vice president: Mr Subramania Natarajan,
Directors: Mr Satish Thiagarajan, Mrs Popi Kuroda, Mr Nitin Hingarh,
Mr Vashdev Rupani, Mr Debendra Mohanta, Mr Markus,
Internal auditor: Mr S. K Rangwani, **Auditor:** Mr VeerasureshKumar Veerappan.

NINE SPECIALISED COMMITTEES:

Information and communication: Mr Debendra Mohanta, Mr Satish Thiagarajan, Subramania Natarajan; **Food & agriculture:** Mr Nitin Hingarh; **Indian restaurants:** Mrs Popi Kuroda; **Legal & regulatory affairs:** Mr VeerasureshKumar Veerappan; **Indian jewellers:** Mr Alok Rakyan; **Merchandise trading:** Mr V B Rupani; **Tourism:** Mr Markus; **Youth Group:** Mr Manjul Agarwal; **Science and Technology:** Dr Sunil Kaul **Regional representatives: Kansai:** Mr Kiran Sethi; **North Japan:** Mr Dilip Mansukhani.

B-1 Yamaman Building, 6-1, Nihonbashi-Koamicho, Cho-Ku, Tokyo 103-0016, Japan
Tel: 03-3249-1080 Fax: 03-5614-0971 Web: www.icij.site Mail: info@icij.site



Durga Puja Program

October 10, 2026

Puja	11:30 AM
Pushpanjali & Prasad	12:30 PM
Lunch	01:00 PM
Cultural Program	02:30 PM
Bisorjon & Boron	04:00 PM

Cultural Program

" Bengal : A Tapestry of Time "

A Journey Through the Music, Dance, Poetry, Theatre and Weaves of Bengal

The Rhythm of Bengal — Evolution of dance

Bengal on the Silver Screen — Uttam Kumar and chhayachhobir gaan

The Spoken Word — From children's rhymes to modern poetry

Behind the curtain — Bengal's theatre

Threads of Bengal — The evolution of Saree and handloom

Participating members : **Bengali Association of Tokyo, Japan's members**

Program coordinated by **Rita Kar**

Venue: Ota City Industrial Plaza (PiO), 2nd Floor Sub Exhibition Hall
1-20-20 Minami Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0035

© Bengali Association of Tokyo, Japan (BATJ). All rights reserved.
Disclaimer: The articles compiled in this magazine are personal opinion of the authors and in no way represent any opinion of BATJ

(Digital version of Anjali 2026 will be available on digital platforms & BATJ website.)

भारतीय राजदूत, टोक्यो
Ambassador of India
Tokyo

2-2-11, Kudan Minami
Chiyoda-ku
Tokyo 102 0074



MESSAGE

I extend my warm greetings and heartfelt best wishes to all members of the Bengali Association of Tokyo (BATJ) on the occasion of the 37th Durga Puja Celebrations, to be held on 10 October 2026.

It is heartening to see BATJ carrying forward this cherished tradition for 37 years, bringing together the Indian community in Japan and sharing the warmth, vibrancy and richness of our cultural heritage with our Japanese friends. Durga Puja is a celebration of faith, togetherness and the triumph of good over evil, and is a beautiful reflection of the enduring friendship between India and Japan.

I also appreciate BATJ's continued efforts to publish its annual literary e-magazine, "Anjali", which provides a meaningful platform to preserve and celebrate our cultural and literary heritage and connect generations.

My best wishes to the organisers and members of BATJ for a joyful and memorable Durga Puja. May Maa Durga bless everyone with happiness, good health, prosperity and harmony.

Shubho Durga Puja!

(Nagma M. Mallick)

Tokyo
August 17, 2026

Tel. : +81-3-3265-5036; Fax : +81-3-3262-2301; E-mail : amb.tokyo@mea.gov.in



CONSULATE GENERAL OF JAPAN
55, M. N. SEN LANE, TOLLYGUNGE,
KOLKATA - 700 040

September 01, 2026

Mr. Syamal Kar, President
Bengali Association of Tokyo, Japan (BATJ)

Message

As the festive spirit fills the streets of Bengal, I take this opportunity to express my heartfelt appreciation for the incredible work you do in organizing Durga Puja in Tokyo. It is truly inspiring to see how, despite being thousands of kilometers away from Bengal, you have kept your rich culture, traditions, and emotions alive for the Bengali community in Japan.

The Bengali Association of Tokyo, Japan (BATJ), deserves heartfelt appreciation for its unwavering dedication to preserving and promoting Bengali culture, traditions, and heritage in Japan. Through tireless efforts, you have created a vibrant cultural bridge that connects Bengalis living far from their homeland with their roots, values, and identity.

Durga Puja organized by BATJ is much more than a religious festival - it is a grand celebration of your identity, heritage, art, music, food, and the joy of togetherness. Through your dedication, countless Bengalis living in Japan are able to experience the warmth of home, create cherished memories with their families, and pass on these beautiful traditions to the next generation.

I take pleasure to inform you that next year 2027 will mark the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Japan and India. Series of events are being planned to commemorate this milestone as well as to deepen the existing positive relationship between the two countries. I believe, that BATJ will definitely come forward to observe this milestone year in Japan as well. Your commitment, passion, and selfless service are truly commendable. May your efforts continue to flourish, strengthening cultural bonds and spreading the spirit of Bengal far and wide.

I wish BATJ, continued success in preserving and keeping the essence of Bengal alive in the heart of Tokyo and for creating a home away from home for Bengalis in Japan.

Sincerely,

ISHIKAWA Yoshihisa
Consul General




BENGALI ASSOCIATION OF TOKYO, JAPAN (BAT.J)
DURGA PUJA 2025



























সম্পাদকীয়

ঘটনাবহুল এ বছরে অনেক বিষয়ই সম্পাদকীয়তে উল্লেখের দাবি রাখে। এখনও অক্টোবর মাস চলছে, আরও কিছু পথ চলা বাকি। প্রতি বছরের মতো এবারও টোকিও বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন সারা বছর ধরে নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে এবং করছে, যা আমাদের আরও কাছাকাছি এনেছে এবং উষ্ণ বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। তবে পৃথিবী যেন আমাদের ছাপিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে, এবং এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যা সরাসরি আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করেছে।

এ বছর আমরা "বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর" উদযাপন করছি — ভারতের ইতিহাসে বন্দে মাতরমের অনন্য ভূমিকা ও তার অবদান স্মরণ করার এক জাতীয় উদ্যোগ। আমাদের সকলের জন্য এ এক গর্বের বিষয় যে, আমাদের সাহিত্যের এই অমূল্য রত্নটি এমন এক সম্মান লাভ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বন্দে মাতরম একদা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জাগরণী মন্ত্র হয়ে উঠেছিল, এবং আজও তা আমাদের কাছে এক অনুপ্রেরণাদায়ী মন্ত্র হয়ে রয়েছে।

বাংলা ও বাঙালির হৃদয়স্পন্দন মহানায়ক উত্তমকুমারকে তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য! বাংলা চলচ্চিত্রে তাঁর অবদানের জন্য কিংবদন্তি এই মহানায়ককে আজও গভীর ভালোবাসায় স্মরণ করা হয়। তাঁর উত্তরাধিকার পরবর্তী প্রজন্মের মনেও দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে চলেছে। তাঁর কালজয়ী চলচ্চিত্র এবং তিনি যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন, তার মাধ্যমে তিনি আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে চলেছেন। একশো বছর পরেও বাংলা তাঁকে কেবল একজন সুপারস্টার হিসেবে নয়, বরং তার স্বর্ণযুগের চিরন্তন হৃদয় হিসেবে স্মরণ করে।

আরেকটি বছর, আরেকটি যুদ্ধ — অথচ চলমান যুদ্ধগুলোরও কোনো সমাধান হয়নি। হ্যাঁ, জ্বালানি তেলের সংকট এবং দীর্ঘস্থায়ী এই সংঘাত কীভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করেছে, তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট সংকটের প্রভাব অনুভব করেছি, যা জ্বালানি ও পণ্যের তীব্র মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়েছে এবং ইয়েনকে আরও দুর্বল করেছে। অন্যদিকে, দুর্বল ইয়েন আবার প্রবাসী পর্যটনের জন্য এক অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছে।

ক্রীড়ানৈপুণ্য ও মানবিকতার এক অনন্য প্রদর্শনী, ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপ — পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফুটবল প্রতিযোগিতা — জুন ও জুলাই মাসে যৌথভাবে আয়োজন করেছিল কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্র। এ ছিল এক রোমাঞ্চকর মাস, যেখানে ছিল হতাশা, আনন্দ, অঘটন ও বিস্ময়ের সহাবস্থান। কলকাতা রাত জেগেছে একসাথে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে, আবার হতাশার অশ্রু ঝরাতেও, যখন শহরের প্রিয় দল আর্জেন্টিনার মেসি বিজয়ী স্পেনের কাছে গৌরব অর্জনের শেষ সুযোগ হারান। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ তুলে ধরেছে অসাধারণ তরুণ প্রতিভাদের — স্পেনের পাউ কুবার্সি ও লামিনে ইয়ামাল, আইভরি কোস্টের ইয়ান দিওমান্দে, মেক্সিকোর গিলবার্তো মোরা এবং বসনিয়ার কেরিম আলাইবেগোভিচ — যাঁরা বিশ্ব মঞ্চে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ফুটবলের ভবিষ্যৎ যথেষ্ট সম্ভাবনাপূর্ণ ও উদ্দীপক। অসাধারণ দৃঢ়তা ও দক্ষতা প্রদর্শন সত্ত্বেও জাপানের অকালে বিদায় নেওয়া সত্যিই মর্মান্তিক ছিল। আমরা প্রত্যাশা নিয়ে সেই দিনের অপেক্ষায় রইলাম, যেদিন ভারতীয় ফুটবলও বিশ্ব মঞ্চ ভাগ করে নেবে।

এ বছর মা দুর্গা আসছেন গজে চড়ে, আমরা শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের প্রার্থনা করি। টোকিওর বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন (BATJ) পরিবার এবার বিশেষভাবে উচ্ছ্বসিত, কারণ এ বছর আমরা দুই দিনব্যাপী উৎসব উদযাপন করছি এবং একসাথে আনন্দ উপভোগ করছি। আমাদের প্রিয় সদস্যদের সুন্দর লেখাগুলি পড়তে পড়তে আমরা ভেবেছি — আজকের যুগে এবং আমাদের এই ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে দুর্গাপুজো আমাদের কাছে কী অর্থ বহন করে, এবং তার প্রতিনিধিত্বে অঞ্জলি পত্রিকার ভূমিকা কী? সবশেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, দুর্গাপুজো সমষ্টিগত সৃজনশীলতার প্রতীক — যার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের অঞ্জলি পত্রিকা, সামাজিক প্রতিফলনের — যা প্রতিফলিত হয় আমাদের সচেতন লেখকদের রচনায়, সাংস্কৃতিক পরিচয়ের — যা আমাদের সদস্যরা তাদের সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত করেন, এবং চিরন্তন নারীশক্তির প্রতীক। আগামী বছর আরও প্রাণোচ্ছল ও আনন্দময় হোক এই প্রার্থনা করি।

শুভ শারদীয়া!



ON OF TOKYO, JAPAN (BATJ)


165th BIRTHANNIVERSARY OF TAGORE- 2025
BENGALI ASSOCIATION OF TOKYO, JAPAN


















F TAGORE- 2025
YO, JAPAN (BATJ)

NNIVERSARY OF TAGORE- 2025
SSOCIATION OF TOKYO, JAPAN (BATJ)







SARASWATI PUJA
BATJ 2025





Editorial

It has been a hectic year and there doesn't seem to be a dearth of events that don't warrant a mention in our editorial. And to think it's only October. As every year the Bengali Association of Tokyo, Japan has been busy with various events that have brought the community closer and built warm bonds. However, the world seems to be rushing past us and there have been so many events that have directly impacted us. Let's touch upon a few.

This year our country celebrates "150 Years of Vande Mataram", a national commemorative initiative to celebrate the spirit of Vande Mataram and its unique role in the history of India. It is a matter of pride for all of us that a priceless jewel from our literature has been given such an honor. Bankim Chandra Chatterjee's, Vande Mataram had become a rallying cry in the Indian Independence Movement and still an inspiring mantra for us.

Our salutations to Bengal's yesteryear heart throb – Uttam Kumar on his 100th birth anniversary! The legendary Mahanayak is fondly remembered for his contribution to Bengali cinema. His legacy continues to make lasting impressions amongst successive generations. He continues to inspire through his timeless films and the cultural heritage he helped build. A hundred years later, Bengal still remembers him not just as a super star, but as the enduring heart of its golden era.

Another year and another war while the ongoing wars haven't ceased yet. Yes, the availability of liquid gold is at stake and we discovered how it impacted our daily lives due to the prolonged conflict and felt the heat of the crisis caused by the closure of The Strait of Hormuz, leading to severe energy and commodity price shock and further weakening the yen. On the flip side a weaker yen has paved the way for robust inbound tourism.

An exemplary show of sportsmanship and humanity, the 2026 FIFA World Cup, the biggest soccer tournament in the world, was jointly hosted by Canada, Mexico, and the United States between June and July. It was an enthralling month, full of heartbreaks, and joy, upsets and surprises. Kolkata was awake late nights heaving sighs of relief in unison and shedding tears of disappointment as city favorite Argentina's Messi missed his last opportunity at glory at the hands of the victorious Spanish team. FIFA World Cup 2026 showcased incredible young talent, with breakout stars like Spain's Paul Cubarsi and Lamine Yamal, Ivory Coast's Yan Diomande, Mexico's Gilberto Mora, and Bosnia's Kerim Alajbegovic turning heads on the global stage. The future of football is promising and exciting. It was indeed heartbreaking for Japan to make a premature exit after showcasing tremendous grit and skill. Whilst we optimistically await the day when Indian football will also share the world stage.

As Ma Durga arrives on an Elephant this year, we hope for peace, prosperity and abundance. The Bengali Association, Tokyo, Japan (BATJ) family is especially excited as this year we celebrate over 2 days of festivities and spend quality time together. While going through the lovely contributions from our esteemed members, we pondered on what Durga Pujo means to us in today's age and in our geography and what role does Anjali play in representing it? In essence, we concluded Durga Pujo symbolizes collective creativity of which our Anjali magazine is a fine example, social reflection as seen in the work of our conscientious contributors, cultural identity as our community members instills in their children, and the enduring power of feminine strength. We hope for resilience for the coming year.

Shubho Sharadiya!

Table of Contents

পথের সঞ্চয় 11
— শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

আমার গ্রাম 11
— শ্যামল কুমার দে

নকলকাতা 13
— দুহিতা সেনগুপ্ত

শামীমা, একটি সুগন্ধী ফুল 14
— আইভি চট্টোপাধ্যায়

আগমনী 16
— শান্তনু চক্রবর্তী

গ্রীসের রস 17
— চন্দ্রিমা কুণ্ড

এক খন্ড কাপড় 18
— সঞ্চিতা ভট্টাচার্য সেনগুপ্ত

প্রোপোজাল 19
— সমর মুখোপাধ্যায়

বিস্মৃত রত্ন 21
— শুচিতা দাসগুপ্ত।

বসন্ত 21
— উমা ঘোষ

সুস্মিতা 22
— তপন কুমার রায়

ক্ষুদ্দার মনে হল লাস্ট ডে'জ অফ পম্পেই'র রেপ্লিকা 25
— অনুপম গুপ্ত

সেতু 25
— বিশ্বনাথ পাল

শুধু আজকের দিন 27
— স্বামী মেধসানন্দ

মহানায়ক 28
— তপন কুমার রায়

সমাজ সংস্কারক শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব 30
— আলপনা ভট্টাচার্য

THEN and NOW 32
— Rita Kar

"Vande Mataram"- The Song That Woke Our Nation ... 33
— Manikchandra Ghosh

A Hospital Visit in Korea 35
— Mita Mukhopadhyay

Saudade 36
— Shruti Upadhaya

Are We Alone? 38
— Viswa Ghosh

Winning Yoga 40
— Sougata Mallik

How do my people live? 41
— Udita Ghosh

Ma ' er Aanchal 43
— Joyita Basu Dutta

Magic In Monotony 44
— Shoubhik Pal

Kolkata and India's Love for Football 47
— Arnab Karmokar

Importance of Love: from Human love to Divine Love .. 48
— Swami Divyanathananda.

A star named Arundhati/ Tarar Naam Arundhati 51
— Piali Bose

Abraham Lincoln In My Eyes 52
— Soham Kundu, Grade 8, 14 years

Ganesha's Cake Shop 52
— Ishaana Mandal, Grade 5, 11 years

懇談会 53
— ロイ　れい子

美しき民族衣装 54
— しずく まゆみ

私、後期高齢者 55
— 長田 雅子子

भाई मनी सिंह जी: ज्ञान, सेवा और शहादत की अमर गाथा 56
— कीर्ती शर्मा

कविताओं का गुलदस्ता 57
— मनमोहन सिंह साहनी

नज़र-ए-इश्क़ का बयान 58
— त्रीभूवन खन्डेलवाल

दराज़-ए-सफ़र 58
— त्रीभूवन खन्डेलवाल

योग भगाये रोग 59
— शांगरीला

ART 60

KIDS ART 63

PHOTOGRAPHY 65

আমার গ্রাম

শ্যামল কুমার দে

"মাঝের গ্রাম" টি গাঁয়ের নাম
যে গাঁয়ে বাড়িয়া উঠেছি,
চলিতে ফিরিতে সুখেতে দুখেতে
"আপনার" বলি জেনেছি।
চাকুরি মিলিল বহু তদবিরে
গাঁ ছাড়ি আসিনু শহরে,
ছেলে মেয়েদের শহুরে করিব
পড়িবে সবার নজরে।
বৃদ্ধ বয়সে গিয়াছিনু গাঁয়ে
কত স্মৃতি ছিল জড়ায়ে,
অতীত গিয়াছে নবীনের চাপে
সকলি গিয়াছে হারায়ে।
রাখাল বালক লাঠি হাতে ধরি
যায় না তো মেষ চরাতে,
গরুর গাড়িটি মেঠো পথ ধরি
যায় না তো ধূলা উড়াতে।
হাঁটুর পরেতে কাপড় চড়ায়ে
পাঠশালে যেত মাষ্টার,
পড়া না পারিলে গাট্টার সাথে
কানমলা দিত কেষ্টার।
খড়ের চালের মেঠো বাড়ি গুলি
হারায়ে গেল কি লুকাতে
দাওয়ায় বসিত সিনান সারিয়া
কালো মেয়ে চুল শুকাতে।
ছাগল ছানাটি থাকি থাকি
শুধু লম্ফ ঝম্ফ করিত,
গাই বাছুরেতে অলস দুপুরে
ছায়াতে জাবর কাটিত।
পাতি হাঁস কত সারি দিয়া যেত
পুকুর ঘাটের পথেতে,
কপোত কপোতী ইতি উতি চাহি
বসিত ধানের গোলাতে।
মুদির দোকানী ঝাঁপটি ফেলিয়া
মাদুরে শরীর মেলিত,
বৌটি তাহার ঘোমটা খুলিয়া
পাখাতে বাতাস করিত।
লেবুর আচার, আমের আচার
রোদ্দুরে রাখা থাকিত,
মাতা ঠাকুরানী ঘুমাইলে তবে
বাড়ির ছোটরা চাখিত।
ঘরের কুকুর বিড়াল পাশেতে
দাওয়ায় নিদ্রা যাইত,
উপরে দাঁড়েতে ময়না পাখিও
চক্ষু মুদিয়া থাকিত।
মাঝ দুপুরেতে আহার অন্তে
গৃহবধূ ঘাটে যাইত,
পুকুর জলেতে বাসন ধুইয়া
আচমন করি ফিরিত।
সন্ধ্যা লগনে কুঁড়ে ঘর সবে
কেরোসিন দীপ শোভিত,
ঘুঁটে কয়লার উনুন গুলিতে
রান্না জোগাড় চলিত।
শাঁখের আওয়াজ উলুধ্বনিতে
সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন -
রাতের আহার অন্তে হইত
কর্তা গিন্নী আলাপন।
সে সব দিনের ছায়া রহিয়াছে,
কায়া তাহাদের কিছু নাই,
রহিয়া রহিয়া স্বপনেতে দেখি
দুধের স্বাদটি ঘোলে পাই।।

পথের সঞ্চয়

শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

প্রাক-কথন

বয়সের হিসেবে আমার জীবনের এখন সান্ধ্যলগ্ন বলা যায়। জীবনের প্রথম পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর দেশে কাটিয়ে বিদেশে পাড়ি জমাই। তারপর ছ' দশকেরও বেশী সময় পেরিয়ে গেছে। বিভিন্ন দেশে বসবাস করেছি বা ঘুরে বেড়িয়েছি, কখনও কাজে কখনও শুধুই ভ্রমণের নেশায়। স্বাভাবিক ভাবেই অনেক ঘটনা বা অভিজ্ঞতা আমার দীর্ঘজীবনের সঞ্চিত সম্পদের মধ্যে পড়ে। আত্মীয়স্বজন-সান্নিধ্যে বা বন্ধুবান্ধবের আড্ডায় অনেক বিচ্ছিন্ন ঘটনা গল্প করেছি অনেক সময়। শুনে অনেকেই পরামর্শ দিত এ গুলি লিখে ফেলতে যাতে আমার পরিচিত পরিমন্ডলের বাইরের গল্প-প্রিয় উৎসাহী পাঠকেরাও এগুলির সন্ধান পায়। কিন্তু আমার মত একজন পরিচয়হীন মানুষের জীবনব্যাপী টুকরো-টুকরো অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণে অপরিচিত পাঠক কতটা আকৃষ্ট হবেন এ ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে লেখার তাগিদ অনুভব করতাম না। কর্মজীবন কেটেছে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় যেখানে নিয়মিত লেখা ও প্রকাশনা ছিল প্রত্যাশিত পেশাগত দায়িত্বের অংগ। কর্মজীবন শেষ হবার পর নিজের পছন্দমত পড়াশোনার পরিধি বাড়াবার সুযোগ এল এবং তার সঙ্গে ক্রমশ মাথায় এল কিছু কিছু লেখার চিন্তাও। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ, ছোটগল্প, কবিতা এবং রম্যরচনা মিলিয়ে কয়েকটি লেখার পর মনে হল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক 'খোসগল্প'ও কিছু লেখা যাক। যে সব ঘটনা বা কাহিনী মনে রয়ে গেছে এবং বহুবার বলার পরেও সুযোগমত আবারও বলা যায় বলে মনে হয় সেইগুলি লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করছি। বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন সময়ে এ ঘটনাগুলি ঘটেছে। পরিচিত, অপরিচিত বিভিন্ন চরিত্র এর অনেকগুলির কুশী-লব, যাদের মুখের ভাষা এবং ভাষার মুখ অর্থাৎ বাচনভঙ্গী নানাবিধ। সে

গুলির বিশেষত্বই যেহেতু অনেক ঘটনাকে মনে রাখার মত করেছে তাই সে সব ভাষা বা বলার ভঙ্গী না পাল্টে অটুট রাখার চেষ্টা করেছি। এর ফলে কিছু লেখা হয়ত অংশত স্থূলতা বা জগা-খিচুড়ি বা গুরুচণ্ডালী দোষে দুষ্ট হয়েছে, কিন্তু সে দোষগুলিই হয়ত পাঠককে আনন্দ দেবে। আর একটা ব্যাপার এই যে কাহিনীগুলি সবই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে বিবৃত হচ্ছে আমার স্মৃতির গহ্বর থেকে। তাই সব কিছু যে অবিকল রাখতে পেরেছি তা হলফ করে বলতে পারছি না। তবে আমার উদ্দেশ্য যেহেতু পাঠকের মনোরঞ্জন করা, সত্যকথনের পরীক্ষা দেওয়া নয় তাই আমার আখ্যায়নে মূল ঘটনাগুলির হেরফের যদি হয়েও থাকে ত 'তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার'? যে সব ঘটনা বা অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে আমার আখ্যানগুলি সাজিয়েছি, সেগুলিতে কোন কাল-ভিত্তিক বা স্থান-ভিত্তিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করিনি। এ গুলি কোন ঐতিহাসিক দলিল নয়, ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ মাত্র। তাই ঠিক কবে বা কোথায় বর্ণিত ঘটনাটি ঘটেছিল তা হয়ত পাঠকের জন্য সব সময় ততটা জরুরী নয়। আসুন, শুরু করা যাক।

লাটসাহেবের নিজের মুখে

দেশভাগের সময় আমার শৈশবকাল। গ্রামে বসবাস করি। সকাল-বিকেল বাড়িতে বাবা প্রায়শই বন্ধুদের নিয়ে আড্ডায় বসতেন। চায়ের আসর। আলোচনায় থাকত সদ্য-সমাপ্ত বিশ্বযুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপার-স্যাপার আর ভারতের চলমান উত্তাল রাজনীতি যার গতি-প্রকৃতি ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। তিন-চারটি খবরের কাগজ বাড়িতে রাখা হত। সেগুলিতে আর রেডিওতে দৈনিক যে সব খবর রটত তাই নিয়ে বয়স্ক এই চার-পাঁচ বন্ধু বসতেন তাঁদের মতামত ব্যক্ত করতে। আমাদের এগুলি বোঝার বয়স তখনও হয় নি, কিন্তু কিছু-কিছু ঘটনা বা নাম যেগুলি বারবার শুনতাম সেগুলি মনে পড়ে। আমাদের মজা লাগত কিছু কিছু নামকে তাঁরা যেভাবে বিকৃত করে বলতেন। যেমন ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন হয়েছিলেন মন্টু ব্যাটেন, জিন্না ঝিঙ্গে, প্যাটেল পটল এবং সুরাবর্দী ছোরাবদ্দি। এই মানুষগুলি সবাই যে আমাদের চেয়ে অনেক দূরের হোমরা-চোমরা মানুষ এটা আমার মত বালকও আন্দাজ করতে পারত। মনে পড়ে খবরের কাগজের ছবিতে স্যুটেড-বুটেড বড়লাট মাউন্টব্যাটেনসাহেবকে দেখে বেশ সুপুরুষ মনে হত, যেমন মনে হত জহর-কোর্ট পরা গান্ধীটুপি মাথায় জওহরলাল নেহরুকে দেখে। তাঁদের পাশে অন্যান্য ভারতীয় নেতারা ছিলেন কেমন যেন ম্যাটম্যাটে। মহাত্মা গান্ধী কেন খাটো ধুতি আর প্রায়-খালিগায়ে থাকতেন বুঝতে পারতাম না। মা বলতেন গান্ধীজি দেশের গরীব মানুষের মত পোশাক পরতে ভালবাসেন।

তারপর জল অনেকদূর গড়িয়ে দেশ স্বাধীন হল, দ্বিখন্ডিত হয়ে। লক্ষ-লক্ষ বাস্তুহারা মানুষ এক দেশ থেকে আর এক দেশে পাড়ি দিল নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়। দেশের নেতারা সরকার গঠন করে রাজত্বে এলেন। মাউন্টব্যাটেনের মত বড় সাহেবরা ফিরে গেলেন নিজেদের দেশে।

আমি নিজে যখন বিলেতে হাজির হলাম তখন অনেক সাহেব ছিলেন যাঁরা কর্মসূত্রে ভারতে বসবাস করেছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন আমার সহকর্মী, কেউ বা অন্যভাবে পরিচিত। আমার সহকর্মী ইংরেজি পড়াতেন এক গিলেস্পিসাহেব, জাতে আইরিশ। মহাত্মা গান্ধী তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে কথা বলেছিলেন পাঁচ সেকেন্ড, সিমলার রাজভবনে। তাঁর ডানহাতটি দেখিয়ে তিনি বলতেন 'দিস হ্যান্ড হাস টাচড দ্য হ্যান্ড অফ দ্য মহাত্মা'। মাউন্টব্যাটেনের মত বড়সাহেবরাও ছিলেন, কিন্তু আগের মতই আমাদের চেয়ে অনেকটা সামাজিক দূরত্বে। ঘটনাচক্রে তাঁর সঙ্গে আমার যে 'ছোটিসি মুলাকাত'টি ঘটেছিল তার বিবরণে আসা যাক।

আসলে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আমার মুলাকাত হয়েছিল দুবার, প্রথমটি ছিল এক মিনিটেরও কম সময়ের, সেটিকে বলা যায় 'ছোট্টি' মুলাকাত। আমার বিলেতবাস শুরু হয়েছে মাত্র কয়েকমাস হবে এমন সময় খবর এল প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী হঠাৎ মারা গেছেন, দেশের বাইরে। সময়টি ছিল শীতকাল। কয়েকদিনের মধ্যে একটি স্মরণসভার আয়োজন করছেন যারা তাদের মধ্যে ছিলেন লন্ডনের পুরনো বাঙালি বিধানদা। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় দীর্ঘদিনের নয়। তাও তিনি আমাকে জানালেন যে অনেক গণ্যমান্য ইংরেজ বক্তাদের মধ্যে মাউন্টব্যাটেনও থাকবেন। হলে পৌঁছেতেই লক্ষ্য করলাম বিধানদা বাইরে অপেক্ষা করছেন নিমন্ত্রিত অতিথিদের স্বাগত জানাতে। আমাকে বললেন তাঁর সঙ্গে থেকে অতিথিদের রিসিভ করায় সাহায্য করতে। আমি খুশি হয়েই দাঁড়িয়ে গেলাম। প্রথম দু-তিনজন যারা এলেন তাদের নাম মনে নেই। কিন্তু মাউন্টব্যাটেনসাহেব গাড়ি থেকে নামতেই তাঁকে চিনতে অসুবিধা হল না। সেই সুপুরুষ চেহারা তখনও আছে, কিন্তু বয়সের ছাপ এসে গেছে মনে হ'ল। বিধানদা হ্যান্ডশেক করে তাঁকে সভায় আসার জন্য ধন্যবাদ জানালেন আর আমাকে ছাত্র বলে পরিচয় দিয়ে আমার নামটি উচ্চারণ করলেন। হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করতে করতে সাহেব হেসে বললেন আমি নামধাম মনে রাখতে পারি না, মার্জনা করে দিও। এই প্রথমবার কোন লাটসাহেবের সঙ্গে আমি মুখোমুখি হলাম।

এর পরের বছর চাকরি-বাকরি ছেড়ে আমি আবার ফুল-টাইম ছাত্র হয়েছি, পার্ট-টাইম পড়িয়ে পেট চালাই। গ্রীষ্মের শুরুতে প্রতি বছরই কিছু ছাত্র পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে যেত। তাই তাদের বিদায় জানাতে সব ছাত্র মিলে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করার রেওয়াজ ছিল। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আছে বা ছিল এমন কয়েকজন অতিথিকেও নিমন্ত্রণ করা হ'ত। সেই বছরের অনুষ্ঠানে কাদের নিমন্ত্রণ করা যায় এই আলোচনা যখন চলছে আমার মাথায় এল দুটি নাম। একজন 'গার্ডিয়ান' পত্রিকার প্রবীণ সাংবাদিক, ভারত-প্রেমী জেমস ক্যামেরন আর অন্যজন মাউন্টব্যাটেন। অনেকেই আমার সঙ্গে একমত হল। কিন্তু কয়েকজন ছাত্র পরামর্শ দিল মাউন্টব্যাটেনকে বাদ দিতে কারণ তারা মনে করে এই ধরণের ছাত্র-পরিচালিত ছোটখাট অনুষ্ঠানে একসময়ের ভারত-ভাগ্য-বিধাতা ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনের মত মানুষ আসতে চাইবেন না। আমাদের জোরাজুরিতে তারা নিমরাজি হয়ে আমাকে ভার দিল নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। আমি বিধানদার শরণাপন্ন হলাম মাউন্টব্যাটেনকে কি ভাবে যোগাযোগ করা যায় জানতে। তিনি বললেন ভারতীয় হাই কমিশন বা দূতাবাসের মাধ্যমে করাই সুবিধাজনক হবে। ভালই হ'ল, হাই কমিশনে যে মহিলা ছাত্র-ছাত্রীদের দেখ-ভালের দায়িত্বে ছিলেন সেই মিসেস ভাটকে আমি চিনতাম। মিসেস ভাটকে ব্যাপারটি জানাতে তিনি বললেন তিনি রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাদের নিমন্ত্রণের দিন-ক্ষণ তাঁকে জানাবেন। সপ্তাহখানেক সময় চাইলেন। দিন দশেক পরে আবার যখন মিসেস ভাটের সঙ্গে দেখা হ'ল তিনি জানালেন মাউন্টব্যাটেন নাকি এক কথায় আসতে রাজি হয়েছেন। আমাকে বললেন লিখিতভাবে সাহেবকে জানাতে। কোন ঠিকানায় জানতে হবে সেটি আমাকে দিলেন। আমি বন্ধুদের সুখবরটি দিতে তারা আবার আমাকেই বলল চিঠিটি লিখতে। আমি মিসেস ভাটের কাছে জেনে নিলাম সাবেক বড়লাটকে সম্বোধণ করার ব্যাপারে কোন প্রোটোকল আছে কিনা। চিঠি পাঠানো হ'ল, ইতিবাচক উত্তর এল সাহেবের পি এ'র জবানিতে, নম্র ভাষায়, কিছু দিনের মধ্যেই।

বিকেল পাঁচটায় আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হবে। আমরা স্টেজ সাজিয়ে, চেয়ার, টেবিল পেতে অপেক্ষা করছি। এক এক করে নিমন্ত্রিত অতিথিরা আসছেন, ট্যাক্সিতে বা টিউব থেকে নেমে পায়ে হেঁটে। তখনকার দিনে নামজাদা মানুষ বা মন্ত্রী-টন্ত্রীরাও বাসে ট্রেনে যাতায়াত করতেন হামেশা। যতদূর মনে পড়ে যথাসময়ে একটি কালো রঙের রোলস-রয়েস গাড়িতে মাউণ্টব্যাটেন এসে নামলেন। আমরা তিন-চারজন ছাত্র-ছাত্রী হলের মুখে তাঁকে স্বাগত জানালাম। তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। আমার বুকে সাঁটা নেম-ট্যাগটির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন 'সো ইউ অ্যা বেঙ্গলি'। হয়ত আমার পদবীটির সঙ্গে তাঁর পূর্ব পরিচিতি ছিল। আমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে

স্টেজে পৌঁছে দিয়ে জানালাম আমাদের অনুষ্ঠান কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে।

এক শিখ ছাত্র ছিল আমাদের এই ছাত্রদলের কর্তাব্যক্তি, তার নাম উপিন্দর দুগগল। তার নিজের সংক্ষিপ্ত স্বাগতিক ভাষণের পর আমি যেন লন্ডনে পড়ুয়া ভারতীয়দের সম্বন্ধে কিছু বলি এটাই ছিল তার নির্দেশ। নিজের ভাষণটি আমি লিখে নিয়ে গিয়েছিলাম যাতে বিষয়বস্তু বাহুল্য-বর্জিত সুখশ্রাব্য হয়। আমাদের প্রজন্মের ভারতীয়দের দৈনন্দিন জীবনে ব্রিটিশ প্রভাব কতটা ব্যাপক তার উদাহরণস্বরূপ আমি উল্লেখ করেছিলাম আমাদের অনুষ্ঠানে সমবেত ছাত্র-ছাত্রীর পারস্পরিক কথোপকথনের মাধ্যম যে একমাত্র ইংরেজি ভাষা সেটি ভারতের কলোনীয় ঐতিহ্যের অন্যতম স্মারক। নিমন্ত্রিত অতিথিরাও আমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে অল্প কথায় তাঁদের বক্তব্য রাখলেন। মনে পড়ছে ক্যামেরনসাহেব সাংবাদিক হিসেবে তাঁর ভারত বাসের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে ১৯৪৭ এ স্বাধীনতা দিবসের এবং ১৯৪৮ এর গান্ধীজির হত্যা দিবসের স্মৃতিচারণ বলেছিলেন। তিনি মাউন্টব্যাটেনসাহেবকে মজা করে খোঁচা দিয়ে বলেছিলেন ঐ দিনদুটিতে কোন কোন ব্রিটিশ ছিলেন রাজ সিংহাসনে। কিন্তু তাঁর মত কলমপেশা সাহেবরা ইতিহাসের সাক্ষী হয়েছিলেন ভারতীয়দের সঙ্গে, দূর থেকে। তিনি বলেছিলেন নেহরুর ঐ দুটি দিনের ভাষণ তাঁর স্মৃতিতে অম্লান কারণ সেগুলি তাঁর চোখে জল এনে দিয়েছিল। তাঁকে নিমন্ত্রণ করার জন্য আমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে মাউন্টব্যাটেন অল্প কথায় তাঁর বক্তব্য রাখলেন। আমাদের মনে করিয়ে দিলেন যে ভারত সহ কমনওয়েলথ দেশগুলির অভাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তাঁর প্রয়াত স্ত্রী এডুইনার নামাঙ্কিত একটি অনুদানের ব্যবস্থা আছে যেটির তত্ত্বাবধান করে ব্রিটিশ কাউন্সিল। আমরা যেন প্রয়োজনমত সেটির সদ্ব্যবহার করি।

এই পর্বটির শেষে থাকত চা-পানের বিরতি যার প্রধান উদ্দেশ্য হ'ত নিমন্ত্রিত অতিথিদের সমবেত ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ দেওয়া। আধ-ঘন্টা-চল্লিশ-মিনিটের বিরতি শেষ হ'লে শুরু হ'ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, তারপর থাকত ভূরি-ভোজনের ব্যবস্থা। নিমন্ত্রিত অতিথিদের কেউ কেউ অনুষ্ঠান শেষ হবার আগেই বিদায় নিতেন, তাই চা-পর্বটিই হ'ত তাঁদের সঙ্গে নেটওয়ার্কিং এর একমাত্র সুযোগ।

সব অতিথিরা লাইন দিয়ে চা-টা নিতেন। আমি আর উপিন্দর সাবেক বড়লাট সাহেবকে জিগ্যেস করলাম তাঁর জন্য কিছু খাদ্য-পানীয় এনে দেব কিনা। তিনি বললেন 'চ'ল দেখা যাক কি আছে'। অর্থাৎ আমাদের অফার প্রত্যাখ্যান করলেন। আমরাও চা হাতে তাঁর সঙ্গে খোশগল্পে মাতলাম। তিনি কথা বলছিলেন যাকে বলে চাঁচাছোলা ভাষায়, প্রচুর অশালীন শব্দ, যেমন 'ব্লাডি' বা 'বাস্টার্ড' সহ। তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে যে মেসেজটি তিনি আমাদের দিলেন সেটিকে বলা যায় 'ঐতিহাসিক'। আমার দিকে তাকিয়ে 'ইউ ব্লাডি বেঙ্গলি' বলে শুরু করলেন। তারপর জানালেন ভারত কখনোই ব্রিটিশের 'কলোনি' ছিল না। আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম 'কিন্তু স্যার আপনি না ছিলেন সর্বশেষ লাটসাহেব'? তিনি হেসে বললেন 'হ্যাঁ, কিন্তু ভারত ছিল আমাদের সাম্রাজ্যের অঙ্গ, কলোনি নয়। উপিন্দর মাথা থেকে কোমর পর্য্যন্ত নিচু করে উত্তর দিল 'স্যার, আমাদের জাতীয় স্টেটাসের ঐতিহাসিক মর্যাদা বাড়ানোর জন্য ধন্যবাদ। বড়লাট সজোরে হেসে উঠে জবাব দিলেন 'হ্যাঁ, তোমাদের শিখজাতটিও ছিল বজ্জাত, বাঙালিদের মত আমাদের জ্বালাত'। তিনি বলে চললেন 'আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার মত কিছু দেশ ছিল আমাদের কলোনি। আমাদের দেশের অনেক সাধারণ মানুষ সেখানে ঘর বেঁধেছে। কিন্তু তোমাদের দেশে ছিল মানুষের ভীড় আর ধূলো-বালি রোগবালাই ভরা অসহ্য আবহাওয়া। সেখানে ঘর বাঁধতে যাওয়া হ'ত আহাম্মকি। তবে যদি বল আমরা কলোনির মতই তোমাদের শোষণ করেছি, তাহলে তুমি ঠিকই বলেছ। আমরা ছিলাম চালাক-চতুর (স্মার্ট) আর তোমরা বোকাসোকা (ডাম্ব), বহুধা-বিভক্ত আর দুর্বল (ফ্রাকচার্ড অ্যান্ড উইক)। তাই আমরা সহজেই তোমাদের বাহুবলে হারিয়ে লুটপাট করেছি'। ইতিহাসের অভিনব ব্যাখ্যা। কিন্তু আমরা তাঁর স্পষ্ট কথার সত্যতা অস্বীকারই বা করি কি ক'রে?

জলসা শেষ হ'ল। মাউণ্টব্যাটেন এবং ক্যামেরনসাহেব আমাদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়াও করলেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে যে সব কথাবার্তা বলছিলেন তাতে প্রচুর ভারত সম্পর্কিত স্মৃতিচারণ ছিল। বিদায় নেবার সময় সাবেক লাটসাহেব আমার আর উপিন্দরের খোঁজ করলেন। আমরা হাজির হ'তে আমাদের আবার ধন্যবাদ দিয়ে বললেন এই ধরনের অনুষ্ঠান তিনি বিশেষভাবে পছন্দ করেন কারণ অল্পবয়স্ক মানুষের সান্নিধ্য তাঁকে আনন্দ দেয়। আমি বললাম 'স্যার, ভারত-ইংল্যান্ড সম্পর্কের যে ব্যাখ্যাটি আজ শোনালেন তা আমরা কখনই ভুলব না, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। তিনি হেসে আমার পিঠে হাত দিয়ে বললেন 'তুমি মনে করিয়ে দিলে আমি ছিলাম লাস্ট ভাইসরয়। কিন্তু আমি বলব আমি ছিলাম ভারতের ব্রিটিশ সেবকদের একজন প্রতিনিধি এবং ভারতের গুণমুগ্ধ বন্ধুদের একজন।

আমরা দুজনে তাঁকে আবারও ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় জানালাম। তিনি আমাদের সকলের সাফল্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা ক'রে গাড়িতে উঠলেন।

নকলকাতা

দুহিতা সেনগুপ্ত

প্রত্যেক ইউরোপীয় শহরের একটা চলমান মুখস্থ খাঁচা আছে।

তাদের সাথে প্রথম আলাপ হয়, দায়ভারহীন একটা স্টেশন থেকে, এত অগুনতি আসা যাওয়ার সাক্ষী সে, যে আর কিছুতে কিছু তার আসে যায়না, পুরোনো ইট এ নতুন সিমেন্ট অথবা পুরোনো দেয়ালে নতুন কাঁচ, সব রোদ বরফ প্রেম বিরহ হাসি কান্না যুদ্ধ শান্তি রক্ত জলের সাক্ষী থাকে শুধু পায়রাদের বাসা গুলো, তাদের গায়ে নতুনের ছাপ থাকেনা, বংশ পরম্পরায় তাদের সেখানেই বসবাস।

স্টেশন এর খুব কাছেই পুরোনো শহর, একটা বিশালাকৃতির গির্জাকে কেন্দ্র করে, যার পরতে পরতে রোমহর্ষক ইতিহাস, যার প্রতিটা কোনায় কোনায় রাখা, সহস্র যুগের বিশ্বাস আর বিশ্বাসঘাতকতার হিসেব।

চার্চ থেকে অনতিদূরে বয়ে চলে কোনো নামকরা বা নাম না জানা নদী, তাতে ভেসে চলে হাঁস আর সময়।

সেই নদী থেকে বাঁক নিলেই, মুখে অনাবিল হাসি আর অগুনতি গ্রুয়েডজি বা বোঁজোঁ বা বনজর্নো নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এক ওল্ড টাউন বা আলস্টেটেন বা ভিএই ভিল বা চিত্তা ভেকীয়া। পাথুরে রাস্তা আর ভঙ্গুর দেয়ালের রঙিন বাড়ি, সামনে অজানা ফুলগাছের টব, কেউ সেই বাড়িতে ঢোকেওনা, বেরোয়েওনা, তবু বারান্দায় ভেজা গামছা মেলা থাকে, বাড়ির ছাদে দেখা যায় অ্যানন্টেনা, আর ভেতরে, দেখতে ইচ্ছে হয়, গ্রামাফোন! এই চিত্রকল্পে বাস্তবতা আনতে, কোনো এক কোণে কোনো অচেনা শিল্পী রোজ পিয়ানো বা অ্যাকর্ডিয়ান নিয়ে বসে, তবু, viewers বা followers এর পরোয়া করেনা। রাস্তার প্রতি বাঁক একটা

কাঠের চেয়ার ধরে থাকে, আর প্রতি কোনায় থাকে একটা ক্যাফে, প্রতি দু ঘণ্টায় এক বৃদ্ধ দম্পতি, এক হাতে আরেক হাত, অন্য হাতে লাঠি নিয়ে আসে, তাদের সেদিন আর কোথাও যাওয়ার তাড়া থাকেনা।

এখান থেকে অনেক দূরে শহরের অন্যপ্রান্তে থাকে নতুন শহর, সেখানে ভিড় করে আসে একঝাঁক হাত, পা, চোখ, মুখ-যাদের ধারণা, তারা এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে, কিন্তু আসলে এক শুক্রবার সন্ধে থেকে আরেক শুক্রবার সন্ধের লুপে এ হারিয়ে গেছে, অজান্তেই।

এই একই কবিতায় মিলান, ফ্লোরেন্স, ভেরোনা, ভেনিস, বার্ন, জেনিভা, জুরিখ, অ্যানেসি, ফ্রাঙ্কফুর্ট, কোলমার, মার্সেই, বাসেল, স্ট্রাসবুর্গ, প্যারিস - এক এক শহর, এক এক পংক্তি। আর প্রত্যেকবার সেই ট্রামলাইন ধরে সোজা এগোলে, শেষ শব্দের অন্তমিলে মেশে, কলকাতা।

সাথে,

স্টেশন-ভিড়-কুলি-ধাক্কা-বাস-জানলা-নদী-হাওয়া-আরাম-আমার-আওয়াজ-গন্ধ-মানুষ-স্বপ্ন-চার্চ-মাঠ-কাক-মন্দির-ক্রিকেট-ঘাট-মোমো-মসজিদ-বাজার-কাঁদা-ঘাম-মানুষ-কুকুর-রিকশা-মিছিল-ট্যাক্সি-সরেবসুন-অটো-ট্র্যাফিক-খুচরো-ফুটপাথ-মানুষ-ফুচকা-গরম-দুধচা-আরাম-টিপ-মানুষ-পরবর্তীস্টেশন-লাইন-শাড়ি-কাজল-জোমাটো-তর্ক-আরসালান-ঘটিগরম-মানুষ-আড়াল-বিদ্যুৎ-চিঠি-বর্গীয়জ-রক্তদানশিবির-বই-প্রেম-কৃষ্ণচূড়া-বাসটাটানুন-প্যারামাউন্ট-রেশন-প্যান্ডেল-সিটখালি-পুটিরাম-মানুষ-এইচিহ্নেভোটদিন-অভিমান-স্মৃতি-রাগ-দুঃখ-হাসি-কান্না-প্রেম-বিচ্ছেদ-ভয়-জেদ-শান্তি-অশান্তি-ভালবাসা-ভালবাসা-ভালবাসা ।।।

কলকাতা, এই বাসটিকেট এর পিছনের ছন্নছাড়া লেখা আর ওই লুকিয়ে নেওয়া - কুঁকড়ে যাওয়া প্রেমপত্র, হালকা ভিজে, অন্ধকার রাস্তার স্ট্রীটলাইট এ পড়া।

পৃথিবীর যেকোনো শহর মাপার, একমাত্র ইউনিট।

শামীমা, একটি সুগন্ধী ফুল

আইভি চট্টোপাধ্যায়

'আমি বেঁচে থাকতে এ কিছুতেই হতে দেব না'। চিত্কার করে উঠলেন সুরঞ্জন।

বাসবী গরম গরম রুটি তাওয়া থেকে নামিয়ে রাখছিলেন। লিলি রান্নাঘর থেকে সবার খাবার প্লেটে প্লেটে রুটি এনে দিচ্ছিল। 'তুই এবার বসে পড়', বাসবী বললেন।

তখনই চিত্কার। খাবার প্লেট ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন সুরঞ্জন। খাবার ছড়িয়ে ছত্রাকার। জলের গ্লাস উল্টে খাবার টেবিল, মেঝে জলময়। রুটি হাতে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে পড়েছে লিলি। অভুক্ত খাবারের প্লেট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ঋদ্ধি।

'আমি মরি, তারপর যা ইচ্ছে করিস। আর যদি মনে হয় যা ইচ্ছে করবি, তাহলে জেনে রাখ আমরা তোর কাছে মৃত'।

'কী বলছ তুমি?' ছুটে বেরিয়ে এসেছেন বাসবী, সারাদিন পরে একসঙ্গে খেতে বসেছ...ছেলেটাকে খেতে দাও। এখনই কথা বলতে হবে? আর এসব কী কথাবার্তা?'

ছেলের পিঠে হাত রাখলেন, 'উঠিস না বাবা...জানিস তো রেগে গেলে বাবার কান্ডজ্ঞান থাকে না...'

'কী? কী বললে তুমি?' গর্জন করে উঠেছেন সুরঞ্জন, 'এই শিক্ষা দিয়েছ ছেলেমেয়েকে? বাবার কাণ্ডজ্ঞান নেই? সেজন্যেই তো ছেলে এমন কাজ করার সাহস পেয়েছে। আমার সামনে এমন কথা বলতে পারল'।

'বৃথা চেষ্টা করছ মা', ঋদ্ধিও উত্তেজিত, 'উনি একজন মহান মানুষ। ওঁর কান্ডজ্ঞানের তুলনা নেই। উনি যা জানেন, যা বোঝেন... তা ব্রহ্মজ্ঞানের মতো জ্ঞান। পৃথিবী কতখানি এগিয়ে গেছে, তার ধারণা নেই। নিজের তৈরি জগতে মহারাজ হয়ে মনে করছেন ওঁর অঙ্গুলিহেলনে দুনিয়া চলবে'।

'চুপ কর ঋদ্ধি, চুপ কর', বাসবী আকুল হয়ে একবার ছেলেকে থামানোর চেষ্টা করছেন, আবার স্বামীর কাছে ছুটে যাচ্ছেন।

'এতবড় স্পর্ধা! ব্রহ্মজ্ঞান! তুই কী বুঝিস ব্রহ্মজ্ঞানের? কুলীন ব্রাহ্মণ আমরা। মুখোপাধ্যায়। ভরদ্বাজ গোত্র। ব্রহ্মবিদ্যালাভের অধিকার আছে, এমন ব্রাহ্মণ। ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক করি। জানিস, কাকে ত্রিসন্ধ্যা-কর্ম বলে? সূর্যোদয়ের আগে, মধ্যাহ্নে এবং সূর্যাস্তের পরবর্তী সময়ে ঈশ্বরের নামজপ, ধ্যান। প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা, সায়ংসন্ধ্যা। প্রত্যেক সন্ধ্যার সময় গায়ত্রীমন্ত্র ধ্যান, জপ। তুই আমাকে অপমান করছিস?'

'অপমান ভাবলে অপমান। তোমার গায়ত্রীমন্ত্র, জপ, ধ্যানের বাইরে একটা বিশাল দুনিয়া আছে। সেই দুনিয়ার খবর রাখো না বলেই আমার কথা তুমি অ্যাক্সেপ্ট করতে পারছ না'। শব্দ করে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল ঋদ্ধিমান, 'তোমার ধারণা নিয়ে পৃথিবী চলবে না। আমি যা বিশ্বাস করি, আমার শিক্ষা আমাকে যা বোধ দিয়েছে, সেইমতো চলব আমি। তুমি আটকাতে পারবে না'।

'সেক্ষেত্রে এই বাড়িতে তোমার থাকা হবে না। আর বাড়ি ছাড়ার আগে ভালো করে ভেবে নিও। একবার বাড়ি ছেড়ে গেলে আমার সম্পত্তির কানাকড়িও পাবে না তুমি'।

ছেলের ছেড়ে যাওয়া চেয়ারে বসে পড়লেন বাসবী। একটুও শক্তি নেই আর। যুযুধান দুই পক্ষ। একদিকে স্বামী, অন্যদিকে একমাত্র পুত্র। নিজের নিজের যুক্তির শাণিত অস্ত্র। যুদ্ধ থামাবে এমন শক্তি কই! শরীর নির্জীব হয়ে এল, শঙ্কায় দুর্বল...লিলি এসে ধরে না ফেললে পড়েই যেতেন। বাপ-ছেলে কারো অবশ্য এদিকে নজর নেই। প্রবল তর্কাতর্কি, বাগবিতণ্ডা।

স্বামীর জেদ, গোঁ, রাগ সবটাই চেনা বাসবীর। তিরিশ বছর আগের ঠিক এইরকমই এক সন্ধ্যার স্মৃতি ভেসে এল।

সেদিন পিতার জায়গায় ছিলেন শ্বশুরমশাই নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় আর পুত্রের জায়গায় ছিলেন আজকের পিতা, সেদিনের ছেলে সুরঞ্জন। বাবা-ছেলের তুমুল তর্কের সময় এইভাবেই শাশুড়িমা নির্জীব হয়ে বসেছিলেন। নতুন বউ বাসবী ভয় পেয়ে লুকিয়েছিল রান্নাঘরে।

বাবা চেয়েছিলেন সুরঞ্জন পারিবারিক কাপড়ের ব্যবসায় যোগ দিক। বড়বাজারের গদীতে সুরঞ্জন বসবে, বাবা বাড়ির লাগোয়া দোকান সামলাবেন। বাবা চাননি তাঁর অবর্তমানে দোকান, ব্যবসা কর্মচারীদের হাতে চলুক। ছেলেকে ব্যবসার উত্তরাধিকার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন।

সুরঞ্জন অ্যাকাডেমিক লাইনে থাকতে চেয়েছিল। এমএসসি, পিএইচডি...গবেষণা,অধ্যাপনা।

বাবা এইভাবেই বলেছিলেন সেদিন, 'সেক্ষেত্রে এই বাড়ি ছাড়তে

হবে। আমার সম্পত্তির কানাকড়ি পাবে না। তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করব। মুখ দর্শন করব না'।

সুরঞ্জন এক কথায় বাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ঋদ্ধি তখন আড়াই বছরের শিশু। লিলির জন্ম হয়নি। অনুগামিনী স্ত্রী আর শিশুপুত্রকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে, শহর ছেড়ে জীবনের নতুন পথে যাত্রা করেছিলেন সুরঞ্জন। শাশুড়িমা ছুটে এসেছিলেন, পিছু ফিরে তাকায়নি ছেলে।

নতুন শহরে এসে সব নতুন করে শুরু করা, থিতু হওয়া সহজ ছিল না। এক কামরার ভাড়াবাড়িতে সংসার জীবন শুরু হল। টিউশন পড়ানো, ছোট ছোট কাজ করা...সেইসঙ্গে নিজের পড়াশোনা...কম লড়াই ছিল না। তবু বাবার কাছে সাহায্য চাইবার কথা ভাবেননি।

বাবা পরে নরম হয়েছিলেন। চিঠি লিখতেন বারবার, 'ফিরে আয়'।

তখন ফোন এমন সহজলভ্য ছিল না। কিন্তু ছেলে ফেরা দূরের কথা, একটি চিঠির উত্তরও দেয়নি। মুখ দর্শন না করার প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। মায়ের ডাকেও মন নরম হয়নি।

বাবার অসুস্থতার টেলিগ্রাম পেয়েও যেতে চায়নি। বাসবী হাতেপায়ে ধরে রাজি করিয়েছিলেন। কিন্তু যতক্ষণে ছেলে গিয়ে পৌঁছল, বাবা অচিন পথে পাড়ি দিয়েছেন। মরদেহের দু'টি চোখ খোলা। যেন শেষমুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন ছেলেকে দেখার। বাবার মৃত্যু, মায়ের অনির্বার অশ্রুধারা সুরঞ্জনকে নাড়া দেয়নি। বাসবী স্বামীর এই কঠিন রূপ দেখে ভেতর থেকে কেঁপে উঠেছিলেন সেদিন। নিজের বাবা-মায়ের প্রতি যে এমন মায়াহীন হতে পারে, তার কাছে কী কোনও সম্পর্কেরই মূল্য আছে?

আজ সেই কথাটাই নতুন করে অনুভব করলেন। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। পিতা-পুত্রের দ্বন্দ্ব।

"সুখমাপতিতং সেব্যং দুঃখমাপতিতং তথা,
চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।"

সংঘাতের ইতিহাস চক্রাকারে ফিরে এসেছে। যদিও এবারের কারণ আলাদা। ঋদ্ধিমান নিজের পছন্দের মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। একই অফিসে সহকর্মী। ঋদ্ধির মতই ইঞ্জিনিয়ার। আপত্তির কারণ, মেয়েটি অন্য সম্প্রদায়ের। অন্য জাতের। এবং অন্য ধর্মের। বাঙালি নয়, ব্রাহ্মণ নয়। দলিত জাতি। এবং সবচেয়ে বড় কথা, মুসলমান ধর্মের মেয়ে।

মুখোপাধ্যায় পরিবারে এমন অনিয়ম? আজন্ম সংস্কার, পারিবারিক মূল্যবোধ, অভিজাত্যের শিক্ষা ভুলেছে এবাড়ির একমাত্র ছেলে। নিজের সর্বনাশ তো করছেই, ছোট বোনটার ভবিষ্যতের কথাও ভাবল না? এই বিয়ের পর কোনও ভালো পরিবারে মেয়ের বিয়ে দিতে পারবেন সুরঞ্জন?

ঋদ্ধিমানের এক কথা, 'আমার জীবন। সে জীবনে জীবনসঙ্গী বেছে নেবার অধিকার আছে আমার। দুনিয়া কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে গেছে, আর তুমি পড়ে আছ জাত-কুল-ধর্ম নিয়ে?'

মাকে বুঝিয়েছে, 'জন্ম তো কারো হাতে নেই মা। বাই চান্স আমার জন্ম হয়েছে হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে, শামীমার জন্ম মুসলমান দলিত পরিবারে। এইটুকু অমিল ছাড়া সব ব্যাপারে আমাদের মিল। আমরা একে অন্যকে ভালোবাসি। তুমি বাবাকে বোঝাও...সময়ের সঙ্গে নিজেকে বদলে নেওয়াই জীবনের চাহিদা'।

ছেলের যুক্তি শুনে সুরঞ্জন রুদ্ররূপ ধারণ করেছেন, 'শাট আপ। দু'দিন বাড়ি ছেড়ে থাকলেই ভালোবাসার ভূত ছেড়ে যাবে। বড়লোকের একমাত্র ছেলে, হিন্দু ছেলে...ভালোবাসার জালে জড়িয়েছে। নিজের জাতে ছেলে পায়নি?'

ঋদ্ধিও গলা তুলেছে, 'অভিজাত্যের বড়াই করছ, অথচ নিজের মেয়ের বয়সী একটা মেয়ের সম্বন্ধে অশালীন কথা বলছ...তার সম্পর্কে কিছু না জেনেই। তোমার চেয়ে তো ওই দলিত বাবা অনেক বেশি অভিজাত, অনেক বেশি শিক্ষিত...বিধর্মী ছেলের সঙ্গে বিয়েতে আপত্তি থাকলেও মেয়ের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেননি'।

'আরে...তুই দুনিয়ার কী জানিস? কতটুকু দেখেছিস? তোকে কলমা পড়িয়ে ধর্ম বদলে দেবে। তুই জানিস মুসলমান মেয়ের সঙ্গে বিয়ের পরিণাম? জানিস ওদের শরিয়তী আইনের কথা?'

'একবার নিজের গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে দ্যাখো'। ঋদ্ধি আরো গলা তুলেছে, 'আজকের পৃথিবীতে অন্য জাতে, অন্য ধর্মে বিয়ে কোনও অপরাধ নয়। প্রায় প্রতি পরিবারে এমন ঘটনা ঘটছে। প্রাপ্তমনস্ক, বুদ্ধিমান বাবা-মায়েরা সহজভাবে সম্পর্ক মেনে নেন, আশীর্বাদ করেন। তুমি জেদ ধরে বসে আছ'।

শামীমার বাবা-মা এলেন একদিন, 'ছেলেমেয়েরা ভালোবেসেছে। আমাদের তো কিছু করার নেই। মেনে নিলেই ভালো'।

বাবা বললেন, 'একবার আমার মেয়েটাকে দেখুন। শামীমা শব্দের মানে বলি? শামীমা একটি আরবি নাম, যার অর্থ সুগন্ধি, মিষ্টি সুগন্ধ বা খুশবু। মেয়ে সত্যিই আমাদের জীবনকে সুগন্ধে আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছে। বড় ভালো মেয়ে'।

মা হাতজোড় করে বললেন, 'খুব ভালো মেয়ে। ছোট থেকে লেখাপড়ায় ভালো। বাধ্য মেয়ে। লক্ষ্মী মেয়ে। আমাদের সমাজেও এ বিয়ে মানতে চায়নি কেউ। শামীমাই বুঝিয়েছে সবাইকে। পীরের থানে গিয়ে অনুমতি নিয়ে এসেছে'।

সুরঞ্জন কথাই বলেননি। বাসবী হাতজোড় করেছেন, চোখের জল ফেলেছেন।

ঋদ্ধিমান বলেছে, 'বাবার চোখ দিয়ে না দেখে নিজের চোখ খোলো মা। নইলে তোমার সংসার সত্যিই ভেঙে যাবে। একবার আমাকে বিশ্বাস করে দ্যাখো। একবার শামীমার সঙ্গে কথা বলে দ্যাখো। ওকে আমি বিয়ে করতে চেয়েছি। আমি পছন্দ করেছি। আমার জীবনের সিদ্ধান্ত আমিই নেব, না?'

'ও আচ্ছা। তোমার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে? বেশ, আমরা অর্থোডক্স। পুরোনো ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাস করি। যাও তুমি, নতুন হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দাও। তোমাকে জন্ম দিয়েছি, খাইয়ে পরিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করে দিয়েছি...এবার উড়ে যাও। যা খুশি, করো। একটা কথা মনে রেখো, তোমার সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক রইল না। তুমি আমার সম্পত্তির ভাগ পাবে না। আমি জানব, আমার একটিই মেয়ে'। সুরঞ্জন নিরাবেগ, কঠিন ।

বাসবীর কোনও কথাই শুনলেন না। উঠে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করলেন।

ঋদ্ধিকে জড়িয়ে ধরলেন বাসবী, 'বাড়ি ছেড়ে যাস না বাবা। সব ঠিক হয়ে যাবে। একটু সময় দে'।

ছেলেও বাবার মতই জেদী। হাত ছাড়িয়ে উঠে ঘরে ঢুকল, তারপর একটা ব্যাগে জরুরি কাগজপত্র নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। চক্রবৎ পরিবর্তন্তে।

তিনদিন হয়ে গেল, ঋদ্ধিমান চলে গেছে। বাড়িটা নিস্তব্ধ হয়ে আছে। ভরা শ্রাবণ মাস। সারাদিন ধরে বৃষ্টি। বারান্দায় চুপ করে বসেছিলেন বাসবী। বাগানে সুন্দর বর্ষার ফুল ফুটেছে, বারান্দায় সিঁড়িতে টবগুলো জলে ধুয়ে ঝকঝক করছে, দূরে গেটের কাছে মাধবীলতা ঝাড় থেকে টুপটাপ জল ঝরছে। রাস্তার ওপরে কদম গাছে অজস্র কদমফুল আলোর মত ফুটে আছে। তবু কিছুতেই মন ভালো হয় না।

ঋদ্ধিমানের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। লিলিকে ওর বন্ধুদের কাছে খবর নিতে বলেছিলেন। খবর পাওয়া গেছে যে, বিয়ে স্থির হয়ে গেছে। রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হবে। কোর্ট ম্যারেজ। আগামী বুধবার। আপাতত এইটুকু জানা গেছে। সুরঞ্জনকে কিছু জানাননি বাসবী।

লিলি এসে পাশে বসল, 'দাদা ফোন ধরল না। আমি কী করেছি? আমার সঙ্গেও কথা বলবে না দাদা?'

'ইগোর লড়াই। বাবা-ছেলের ইগোর লড়াই'। বাসবী মৃদুগলায় বললেন।

'দাদার বিয়ে হবে...আমরা যাব না?'

'চুপ, চুপ। বাবা শুনতে পাবে'।

সুরঞ্জন খবরের কাগজ হাতে বসেছিলেন। সব কথাই কানে

আসছিল। রাহুলের সঙ্গে কথা হয়েছে লিলির। খবরটা জানার ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞেস করেননি। দুর্বলতার কোনও লক্ষণ প্রকাশ না পায়।

এইসময় ঠুং করে আওয়াজ হল গেট খোলার। একটি ছিপছিপে তন্বী মেয়ে ভেতরে ঢুকলো। আর ঠিক তখনি বৃষ্টি থেমে গিয়ে সুন্দর নরম নরম রোদ উঠল। মেয়েটার পরনে টিয়া সবুজ রঙের কামিজ, মেরুন রঙের সালোয়ার... মেরুন ওড়না। মাথায় লম্বা বেণী... আজকাল মেয়েদের এত লম্বা চুল দেখা যায় না। বৃষ্টিস্নাত মাধবীলতার সবুজ আবহে চমত্কার মানিয়েছে মেয়েটাকে।

এগিয়ে আসতে স্পষ্ট হল চেহারাটা। বেশ লম্বা, সুগঠিত শরীর, ধবধবে ফরসা না হলেও গৌরীই বলা যায়। ভারি সুন্দর মুখখানা, লালিত্য লাবণ্যে মনোরমা। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে বারান্দার সিঁড়িতে এসে থমকে দাঁড়াল।

'দ্যাখ তো লিলি, কি চায় মেয়েটা'। বাসবী নির্বিকার বসেই রইলেন।

লিলিকে দেখে মেয়েটা একটু হাসার চেষ্টা করল, 'আমি একটু এবাড়ির বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই'।

'কেন? কী দরকার?'

কুণ্ঠিত পায়ে সিঁড়ির ধাপে পা রাখল মেয়েটা, 'তুমি তো লিলি। আমার কিছু কথা আছে বাবা-মায়ের সঙ্গে। একটু সময় লাগবে'। বাসবীর দিকে তাকিয়ে লালচে হল একটু, 'মা?'

'কী দরকারে এসেছেন, বলুন'।

'সরি, আমার ফোন করে আসা উচিত ছিল'। মেয়েটা আরো একধাপ উঠে এল, 'সকাল সকাল এসে ডিসটার্ব করলাম'।

'এদিকে নিয়ে আয়'। বাসবী খেয়াল করেছেন মেয়েটার চোখ দুটো সজল, মুখশ্রী বিষণ্ণ।

'আমি ওর মা। বলো'।

'আমি শামীমা'। এগিয়ে এসে নত হল মেয়েটা। এত অবাক হয়েছেন বাসবী, প্রতিক্রিয়া জানাতেও পারলেন না।

'কে এসেছে?' সুরঞ্জনের গলা। লিলি সচকিত হয়ে তাকাল মায়ের দিকে। তারপর মেয়েটার দিকে।

'আমি আপনার আর বাবার কাছে এসেছি', আকুল গলায় বলল শামীমা, 'দু'টো কথা বলেই চলে যাব'।

'কোরআনে বলে আল্লাহ, তৌরাত বলে জেহোভা, ইঞ্জিল বলে ঈশ্বর, আবেস্তা বলে আহুরা-মাজদা, গুরুগ্রন্থ সাহেব বলে এক-ওমকার। স্মৃতি-শ্রুতি, সংহিতা-গীতা, বেদ-পুরাণ বলে ভগবান। সবাই এক'।

স্নিগ্ধ সুন্দর কথা বলার ভঙ্গি। একটুও প্রসাধন নেই। কপালে একটা টিপ পর্যন্ত নেই। অথচ অনির্বচনীয় দীপ্তিতে উজ্জ্বল মুখখানায় আলোর বার্তা, 'হরেক গ্রন্থে হরেক স্রষ্টার নাম। কিন্তু সবখানেই একক স্রষ্টার জয়গান। শুধু কী তাই? গীতায় আছে আহমদের নাম। তৌরাত তাকে বলছে মেউদ মেউদ, হিব্রু ভাষায় প্যারাক্লিতোস । ইঞ্জিলে তাকে বলা হচ্ছে সহায়, পুরানে কল্কি। ত্রিপিটক বলছে মৈত্তেয়, এ্যানালেক্ট বলছে সাধু, জেন্দাবেস্তা তাকে আহমদ বলে, আর কোরআনে বলে মুহাম্মদ। তবু মানুষ এক হয় না। আলাদা আলাদা নাম নিয়ে লড়াই করে। মানুষে মানুষে দূরত্ব। ভালোবাসা নেই। মানুষ নিজেকে ভুলে থাকছে'।

সুরঞ্জন স্থির হয়ে বসে রইলেন।

'আপনার ছেলে কোর্ট-ম্যারেজের দিন ঠিক করেছে মা। কিন্তু বাবা-মায়ের আশীর্বাদ ছাড়া কী বিয়ে হয়?'

বিক্ষিপ্ত, বেদনার্ত গলায় সজল চোখে সুরঞ্জনের দিকে তাকালো, 'আপনি যদি চান, কোর্ট-ম্যারেজের আগে বা পরে মন্দিরে হিন্দুমতে বিয়ে হবে। আমার বাবা-মা যদি চান, মুসলমান মতেও বিয়ে হবে। রিচুয়াল মেনে চলতে হলে আমি আমৃত্যু তা মেনে চলব। কথা দিলাম। কিন্তু আমি পরিবারকে বাদ দিয়ে একলা ঋদ্ধিকে বিয়ে করতে চাই না'।

আহা শামীমা! ঠিক ওর নামের মতই পবিত্র, নিষ্পাপ। সুগন্ধী ফুল।

ওকে কোনো ভয় নিয়ে, ছলনা নিয়ে বাঁচতে হবে না। মায়ায়, মমতায়, ভালোবাসায় সব ভয় মুছে ফেলার মন্ত্র জানে ও। প্রশ্ন আর অন্বেষণ। এই নিয়েই তো নিবিড় যাপন। ধর্ম নিয়ে, সংস্কার নিয়ে আলোচনা। যুক্তি, তর্ক, একমুখী যাপনের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি। তবেই তো দর্শন তৈরি হয়।

জীবনদর্শন। জীবনবোধ। নদীর মত গতিময়তা। নতুন নতুন পথে, নতুন নতুন নামে বারে বারে নিজেকে আবিষ্কার।

শামীমা চলে গেছে অনেকক্ষণ। সুরঞ্জন একটা কথাও বলেননি।

'কিছু বলবে না?'

'বিয়ের আগেই মেয়েটা এমন একা একা চলে এল। ওর বাবাকে কল করো। ঋদ্ধিকেও...'

'কেন? আবার কী বলবে তুমি? আবার অপমান করবে ঋদ্ধিকে? এমন একটা মেয়ে, এমন সততা সাহস আত্মমর্যাদা...' গলা ধরে এল বাসবীর।

'আমি তাই বললাম?' সুরঞ্জনের গলাটাও ধরা-ধরা, 'বলো, বিয়েটা এমনিই হবে। একা একা কোর্ট-ম্যারেজ করার দরকার নেই'।

'ও বাবা! লাভ ইউ বাবা!' লিলি আনন্দে লাফিয়ে উঠেছে।

'বড্ড দেরি হয়ে গেল কথাটা বুঝতে। আগে বুঝলে বাবা-মাকে...' জলের ধারা নেমে এল সুরঞ্জনের গাল বেয়ে, 'মানুষের জীবন নদীর মতো। সব নদীর আলাদা যাত্রাপথ। একত্রে যাত্রা শুরু করেও শাখানদী এগিয়ে চলে নিজের পথে। পথের যত বাধা-বিঘ্ন নিজেকেই পেরিয়ে যেতে হয়। সব বাবা-মা চায় সন্তানের জীবন হোক মসৃণ। কিন্তু জীবনের নিজস্ব কিছু নিয়ম আছে। চলার পথের অভিজ্ঞতাই তৈরি করে জীবনবোধ। আমরা সেই জীবনবোধকে সম্মান জানাব না? বাবা-মায়ের কাছে আমার ফেরা হয়নি... একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দেওয়া যায়?'

কোথাও কিছু নেই, বুকের মধ্যে থেকে কান্না উঠে এল বাসবীর। চোখ থেকে জলের ধারা নেমে এল অনর্গল। ঋদ্ধি কোনোদিন একলা হবে না। পতি-আজ্ঞা পালন করতে গিয়ে বাসবী একদিন একা করে দিয়েছিলেন সুরঞ্জনকে। অনুগামিনী স্ত্রীর কর্তব্য-পালন হয়েছে, কিন্তু পুত্রহারা বৃদ্ধ-বৃদ্ধার একাকী জীবনের দায় রয়ে গেছে।

শামীমার জীবনে তা হবে না। ও কোনোদিন ঋদ্ধিকে একা হতে দেবে না। থাকবে ঋদ্ধির সহগামিনী হয়ে। যথা অর্থে সহধর্মিনী হয়ে। বৃষ্টি শেষের আকাশ আলো-আলো। ভারি সুন্দর নীল। গাছের দোলায় গানের সুর। ঠান্ডা হাওয়ায় ভেসে এল নাম-না-জানা গন্ধ। সুগন্ধী ফুলের গন্ধ। শামীমা।

আগমনী

শান্তনু চক্রবর্তী

ঢাকের তালে দেবী যদি
আসেন শুধু ক্যালেন্ডারে,
তবে কেন কাঁদে মানুষ
বছর জুড়ে অন্ধকারে?
কাশের বনে শরৎ নামে,
শিউলি ঝরে নীরব ভোর—

তবু কত ঘর অচেনা,
বন্ধ থাকে মনের দোর।
মাটি কেবল প্রতিমা গড়ে,
প্রাণ তো গড়ে মানব-হাত;
অহংকারের দশটি মাথা
আজও হাঁটে যে দিন-রাত।

রাবণ কোথায়?—আয়নাতে।
মহিষ কোথায়?—লোভের ভিড়ে।
অস্ত্রগুলো মরচে ধরে
স্বার্থ যখন হৃদয় ঘিরে।

দেবী তবে আসেন কবে?
ঢাকের আগে, মন্ত্রের আগে—
যখন কেউ এক ফোঁটা আলো
রেখে যায় কারও ভাগে।

যখন ক্ষমা জিতে নেয়
অভিমানের যুদ্ধ যত,
যখন শিশুর হাসির কাছে
দ্বেষ ও ক্রোধ হয় বিরত।

যখন ক্ষমার একফোঁটা জল
ধুয়ে দেয় সব ক্ষয়,
যখন কারও চোখের জলে
অন্য হৃদয় কাঁদতে রয়।

যখন নিজের সুখের চেয়ে
পরের দুঃখ বড়ো হয়,
সেই মুহূর্তেই দেবীপক্ষ
নিঃশব্দে নেমে রয়।

কৈলাস তবে দূরে কোথায়?
মানুষ যত সত্য হয়,
মায়ের চরণ ততই নেমে
ধূলির পথে সঙ্গী রয়।

প্রতিমা ভাসে, রঙ ফিকে হয়,
নিস্তব্ধ হয় ঢাকের বোল—
যদি না জাগে অন্তর-মন্দির,
অসম্পূর্ণ থাকে কোলাহল।

তাই এসো মা—মন্দির নয়,
মানুষগুলোর হৃদয় জুড়ে;
তোমার বিজয়া হোক এ বছর
মানুষ হবার পথটা ধরে।

গ্রীসের রস

চন্দ্রিমা কুণ্ড



"কি কিনে আনলি?"
"ডোনাট "
"এখানে এসেও ডোনাট? জাপানে তো সব সময় পাওয়া যায়। গ্রীসে এসেও ডোনাট খাবি?"
"এখানের ডোনাট স্পেশাল।"
"কি আবার স্পেশাল। দে খেয়ে দেখি তো কেমন?"
আমি আর আমার হাজব্যান্ড খেয়ে দেখলাম একটু করে।

পরের দিন সকালে আমার মেয়ে ডোনাটের বাক্স খুলে দেখে মাত্র দুটো ডোনাট পরে আছে। সব মিলে দশটা ডোনাট ছিল। বাঙালি বাবা মায়ের হাত থেকে এই রকমের ডোনাট বাঁচানো সহজ ব্যাপার নয়। এ ডোনাট কোনো সাধারণ ডোনাট নয়, একেবারে রসে ডুবানো স্পেশাল ডোনাট।

দুই ছেলে মেয়ে নিয়ে জাপান থেকে গ্রীসে এসেছি বেড়াতে আমি আর আমার হাজব্যান্ড। নতুন দেশে এলে সেখানের খাবার

ট্রাই করি, এখানেও করেছি। বেশ ভাল লেগেছে কিছু খাবার। কোনো দেশে আসার আগে যেমন কোথায় কোথায় ঘুরবো

বেড়াবো সেগুলো আগে থেকে স্টাডি করে আসে তেমনই কি কি খাবার সেই দেশের স্পেশালিটি সেটাও জেনে আসা আমার

মেয়ের অভ্যাস।

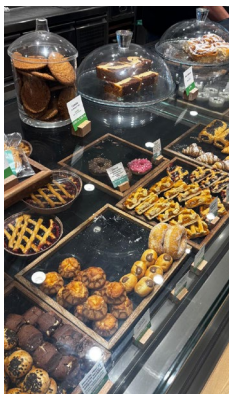
সত্যি এই ডোনাট আমার মাথা ঘুড়িয়ে দিল একেবারে। আমরা বাঙালী ফ্যামিলি, কলকাতাতে বড় হয়েছি। রসের মিষ্টির সাথে আমাদের আত্মার সম্পর্ক। বাংলার রসের মিষ্টির কথা কে না জানে।

বাংলার বাইরে ভারতের অনেক জায়গাতে ঘুরেছি। অনেক ধরনের মিষ্টি খেয়েছি। কিন্তু বাংলার মিষ্টির জাত একটু স্বতন্ত্র। রসে ডোবানো রসগোল্লা হোক বা বাইরেটা শুকনো কিন্তু এক কামড়ে মুখের ভিতর রসে ভরে যাওয়া চমচম কিংবা মৌচাক। এই স্বাদ কিন্তু ভারতের কোনো প্রদেশের মিষ্টির মধ্যে নেই। কর্মসূত্রে বহুদিন জাপানে বসবাস। সেখানের মিষ্টিও সুস্বাদু। কিন্তু রস, ওই ব্যাপারটা আর কোথাও তো খুঁজে পাই নি।

যাইহোক গ্রীসের নানা দর্শনীয় স্থান ঘুরতে ঘুরতে তাদের নাম করা খাবারের স্বাদও নিয়ে চলেছি। বাঙালি মানেই ঘোরা আর তার সাথে সাথে খাওয়াও চালাতে হবে, তবেই না বিশ্ব দর্শন আনন্দময় হবে। বেশ কিছু খাবার খুব মন জয় করে নিলো। তার মধ্যে ছিল Souvlaki & Gyros যেটা ক্লাসিক ফাস্ট-ফুড বিকল্প যেখানে গ্রিল করা মাংস গরম পিটা রুটিতে পেঁয়াজ এবং টমেটো দিয়ে মোড়ানো থাকে। তাজা সামুদ্রিক খাবার (Fresh Seafood), গ্রীক স্যালাড (Greek salads) যার উপরে এক টুকরো বড় ফেটা চিজ দেওয়া, গ্রীক পাই (Greek pie) যার বৈশিষ্ট্য হলো একটি খাস্তা মাখনযুক্ত ফিলো ক্রাস্ট, যার ভেতরে পালং শাক, ফেটা চিজ, ভেষজ এবং ডিমের একটি সুস্বাদু মিশ্রণের স্তর থাকে।



খাবারের গল্প শোনানো আমার উদ্দেশ্য নয়। পাঠকের জিভে জল এনে আমার কি লাভ? আমার জানার ইচ্ছে হলো শুধু কি ডোনাটেই রসের ব্যবহার করে এরা? জানতে হলে হামলা করতে হবে রাস্তার পাশের ডেসার্টের দোকানগুলোতে। বাকলাভা তো বেশ চেনা একটা নাম, জাপানের দোকানেও উচ্চ দামে বিক্রি হতে দেখেছি। একদিন ব্রেকফাস্ট এ পাই এর সাথে একটা করে বাকলাভা কিনে নিলাম। উফ কি খেতে! মুচমুচে খাস্তা একটা মিষ্টি ভিতরে কুচানো বাদাম ঠাসা আর --আর ----হাঁ , হাঁ ঠিক ধরেছি মিষ্টি রসের ছোঁয়া। হাতেও তো লেগে আছে রস।



একে একে দোকানদারদের জিজ্ঞাসা করে করে সব কয়টা নাম করা মিষ্টি ট্রাই করে ফেললাম। খাবার সময় সর্বদা পেটে একটু করে জায়গা ছেড়ে রেখে দিতাম সব শেষে মিষ্টি খাবার জন্য। মেলোমাকারোনা - মধুর রসে ডুবানো কুকি, যা প্রায়শই দারুচিনি এবং লবঙ্গ দিয়ে মশলাযুক্ত করা হয়। গালাক্টোবুরেকো - সিরাপ সহ কাস্টার্ড ভরা একটি পেস্ট্রি। গালাক্টোবুরেকো - একটি ক্রিমি সুজির কাস্টার্ড যা মাখনযুক্ত, সোনালি ফাইলো ক্রাস্টের ভিতরে বেক করা হয় এবং হালকা সিরাপে ভেজানো থাকে। পোর্তোকালোপিতা - একটি চমৎকার আর্দ্র, কুচি করা ফাইলো কেক যা তাজা কমলার খোসা এবং সাইট্রাস সিরাপে ভরপুর। কারিদোপিতা - একটি গভীর সুগন্ধযুক্ত, মশলাদার আখরোটের স্পঞ্জ কেক যা দারুচিনি, লবঙ্গ এবং মিষ্টি সিরাপে পরিপূর্ণ।

গ্রীসের দর্শনীয় শহর, দ্বীপ ঘুরে চলেছি, ভালো ভালো খাবার খাচ্ছি আর মনের মধ্যে ঘুরছে কে সেই ব্যক্তি যে সুস্বাদু রসের তৈরী মিষ্টির কনসেপ্ট নিয়ে এলো আমার জন্মের শহর থেকে সুদূর এই দেশে ! ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় রাসবিহারী বসুর ভারত থেকে জাপানে পালিয়ে যাওয়া আর টোকিওর শিনজুকু নাকামুরায়া রেস্তোরাঁয় খাঁটি ভারতীয় কারি (curry) রান্নার পদ্ধতি প্রবর্তনের গল্প ঘুরে ফেরে লোকের মুখে মুখে। গ্রীসের রসের মিষ্টির পিছনে তাহলে কার হাত?? একটু খোঁজ করে জানলাম গ্রীসে মিষ্টি বানানোর সময় সুগন্ধযুক্ত চিনি ও মধুর সিরাপ ব্যবহার করা হয়।

ঘুরতে ঘুরতে সময় যে কিভাবে কেটে গেলো বুঝতেই পারলাম না। এসে গেলো ফিরে যাবার দিন। নিজের ভাল লাগাটাকে বন্ধু পরিজনের মধ্যে একটু ভাগ করে নিতে সব সময়ই ভালো লাগে। তাই গ্রীসের মিষ্টি সংগ্রহ করতে বেশ একটা নাম করা ডেসার্ট এর দোকানে চলে এলাম রিটার্ন ফ্লাইটের চার ঘন্টা আগে। মিষ্টি, কেক, আইসক্রিমের অপরূপ ভান্ডার ছিল সেই দোকান। কেক বা আইসক্রিমের বাহার তো অনেক দেখা। বাঙালীর চোখ চকচক করে ওঠে মিষ্টির বাহারে। কি অদ্ভুত নিয়ম এই দোকানে। পছন্দ করার আগে একটু ট্রাই করে দেখতে পারো যদি স্বাদটা থাকে অজানা। আমরা বিদেশী আর গিফট হিসাবে বেশ কিছু আইটেম কিনতে চাই বুঝতে পেরে একের পর এক ট্রাই করতে দিল দোকানদার। কত টাকার মিষ্টি খেলাম ফ্রি তে। যেমন সুন্দর দেখতে বিক্রেতা তেমন তার মিষ্টি ব্যবহার। ট্রাই করতে দিয়ে তো বেশি বিপদ হয়ে গেল! সমস্যা হল কোনটা ছেড়ে কোনটা কিনি? ব্যাগেজ এর জায়গা এবং ওজন সীমা সব তো সীমিত। একটা সময় মনে হল এই দোকানের উল্টো দিকে যদি আমাদের বাড়ি হতো! রোজ আসতাম আর একটা বা দুটো করে মিষ্টি খেয়ে দেখে কিনে নিয়ে যেতাম।

"তাড়াতাড়ি পছন্দ করে কেনো, ফ্লাইটের সময় হয়ে যাচ্ছে।" হাজব্যান্ড এর ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেলাম।

"আর তো আসা হবে না এখানে।"

"কে বলেছে? রিটায়ার্ড লাইফ কাটানোর জন্য এই দেশ টা মন্দ নয়। "

"তাই? তোমার এতো ভালো লেগেছে?"

"এখানের ইকোনমির যা অবস্থা রোজের জিনিস সস্তা হবে, আর আবহাওয়াও কি সুন্দর। খাবারের কথা আর কি বলব। মাংস, আলুর কোয়ালিটি দেখেছ? আর মিষ্টি, এখানেই সেটল করবো বুঝলে?"

হাজব্যান্ডের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। এই বয়সের হাজব্যান্ড বাড়িতে থাকলে তাদের কোন দিকে চোখ যাচ্ছে, কোন দিকে মন যাচ্ছে তার খোঁজ রাখেনা এমন মেয়ে খুঁজে পেলে আমার নাম আমি বদলে ফেলবো, কথা দিচ্ছি। গ্রীসের মানুষের সৌন্দর্য বিশ্ববিখ্যাত। ছেলে হোক বা মেয়ে সবার চেহারা, মুখ দেখবার মতো। এই সব ছেড়ে মন কাড়লো কিনা গ্রীসের মিষ্টির রস!

রসে বশে থাকুক প্রতিটি বাঙালি।

এক খন্ড কাপড়

সঞ্চিতা ভট্টাচার্য সেনগুপ্ত

রুমাল অতি সাধারণ জিনিস, কমবেশি সবাই তাকে চিনি। ওই একরত্তি কাপড়ের টুকরোর উৎপত্তি, আভিজাত্য বা ঐতিহ্য কিম্বা আবিষ্কারক কে বা কারা। ঐ ছোট্ট এক খন্ড কাপড় তার দেমাক কি কম!! রসো ভাই তিনি আবার হেলা ফেলা সহ্য করেন না। রুমাল যেমন সম্পর্ক তৈরী করে তেমনি সম্পর্কে ফাটল ও ধরায়, হয় তো বা এটা কুসংস্কার। তা যাই হোক আমাদের দেশে কিন্ত রুমাল তেমন পাত্তাই পেত না ছোট বেলায়। তার অবশ্য কারণ আছে। আমাদের দেশ ছিলো বস্ত্র শিল্পে ধনী, বৈদেশিক বাণিজ্য চলত রমরমিয়ে। কাজেই ঐ খন্ড

টুকরোর উপর তেমন টান অনুভূত হয় নি। আমাদের ছেঁড়া কাপড় দিয়ে নকশি কাঁথা, মা, ঠাকুমা বা মহিলাদের হাতের স্পর্শে আন্তর্জাতিক মান পেতো আর পাগড়ী ছিলো যেমন সম্মানের প্রতীক, তেমনি মেহনতী মানুষের রক্ত ও বিন্দু বিন্দু ঘাম মোছার কাজেও ব্যবহৃত হত। অবশ্য প্রখর রোদ থেকে ও বাঁচার হাতিয়ার ছিলো পাগড়ী। আসলে আমাদের সেই সময়ে কিছুই ফেলনা ছিলো না। সবেতেই সোনা ফলতো।

যাকগে এবার একটু পট পরিবর্তন করে বাহির বিশ্বের দিকে তাকাই। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে রুমালের ব্যবহার হতো। তা হোকগে তবে Handkerchief শব্দটি এসেছে kerchif শব্দ থেকে। আবার এটা নাকি ফরাসি শব্দভান্ডার গত cover chef থেকে এসেছেন। উনি নাকি মাথার ঢাকনা / টুপি। তার মানে রুমাল মাথায় ও হাতে রাখার একখন্ড কাপড়। বেশ বেশ তাই না হয় হলো, কি আশ্চর্য ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের জনগণ তাদের কপাল,নাক,মুখ মোছার জন্য রুমাল কে পকেটে রাখতে লাগলেন। যুক্ত হলো কার্চিফ শব্দটির সাথে হাত। ইউরোপীয়ান মানুষরা জামার হাতায় নাক মুখ কপাল না ঘষে পকেট হতে একটুকরো রুমাল বার করে ব্যবহার শুরু করেন।

অনেকে আবার ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় রিচার্ডকে রুমালের জনক বলে মনে করেন। তার সভাসদদের নথিপত্রে চারকোনা রুমালের উল্লেখ আছে। ঐ বর্গাকার কাপড়ের সৌভাগ্য কি কম, শেক্সপিয়ারের সময় ও তিনি উপস্থিত ছিলেন প্রমাণ আছে। তাঁর নাটক ওথেলো তে রুমাল গুরুত্ব পেয়েছে।

যাক বাবা রুমাল কেবল পকেট বা ব্যাগে রাখার বস্তু তা নয়। তিনি কিন্তু সম্মান সূচক বার্তা ও বহন করেন। কোটের বুক পকেটে শোভাবর্ধক লোকশিল্প, লোকনৃত্য ও বিভিন্ন দেশের লোকসংস্কৃতির অংশ রুমাল। রুমাল নাড়িয়ে যেমন সম্মান দেখানো, প্রেম নিবেদন করা যায় তেমনি সাদা রুমাল উড়িয়ে শান্তি সন্ধিস্থাপনের ও নজির আছে।

রুমালের মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি ও কিন্তু কম নেই।

আমদের দেশের দিকে তাকালেই তা স্বচ্ছ আলোর মতন, দস্যু তস্করেরা রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে অপকর্মে লিপ্ত হতো / হয়, আবার রুমাল দিয়ে মানুষের গলায় ফাঁস দিয়ে লুটপাট করে। এমন কিছু হত্যা পর্যন্ত করতো /করে।

আমাদের দেশে ধর্মদ্বারে রুমাল শ্রদ্ধার প্রতীক। যেমন ধরুন শিখ সম্প্রদায়ের গুরুদুয়ারাতে উন্মুক্ত মস্তকে প্রবেশ নিষিদ্ধ, নিদেন পক্ষে একখন্ড রুমাল মাথায় বাধা থাকে তা পাগড়ীর সমান সম্মান বহন করে।

হিন্দু ধর্ম মত অনুসারে দেব দেবীর যজ্ঞের অনুষ্ঠানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলে পূজার আসনে মাথা ঢেকে বসার বিধান রয়েছে। সেখানেও সেই অমূল্য কাপড় খন্ড। দেবতাদের আরতি করার সময় ও রুমালের ব্যবহার প্রচলিত আছে। এতো গেলো ধর্মের নিয়মাবলি।

এবার একটু ফিরি অন্য কথায়, রুমালের অপর নাম পকেট স্কয়ার অবশ্য যাদের পকেট নেই তাদের কাছে তিনি ব্যাক স্কয়ার। অনেক কমেডি চরিত্রে রমালের উপস্থিত রয়েছে। চার্লি চ্যাপলিন কে রুমাল হাতে বহুবার দেখা গেছে হাসির ফোয়ারা তুলতে। "হ্যাঙ্কি পঙ্কি" র নায়ক কিন্তু একটি কথা বলা রুমাল, ভাবা যায় কি স্পর্ধা রুমালের!!

রুমালের উপর হস্ত শিল্প পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহুকাল ধরেই প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে রুমালের উপর কৃষ্ণলীলা, মধুবনী শিল্প, রাজরাজাদের কীর্তি, শকুন্তলা, ইত্যাদি ঘরের শোভাবর্ধক রুপে পরম্পরাগত ভাবে চলে আসছে। আর একটি কথা না বললেই নয় রুমালের উপর প্রাকৃতিক রং প্রয়োগ করেও শিল্পীরা তাদের মননের বিকাশ ঘটিয়ে আসছেন।

রুমাল কিন্তু বিপদে বন্ধুর কাজ করে। ঐ নরম সূতী খন্ডখানি কোথাও আঘাত লাগলে পাশে দাঁড়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার সম্বল হয়ে।

এবার একটু ফিরি রান্না ঘরে তিনি কিন্তু এঘরেও আছেন। রান্না করতে করতে বহুবার হাত মোছা, রান্না শেষে পরিছন্নতার প্রকল্পে তার জুড়ি নেই। পরিছন্নতার সমাপ্তি ঘটে গরম জলে রুমালে স্নান পর্ব দিয়ে। রান্না ঘরেই যখন ঢুকলাম মোঘল আমলের কথাটা বলেই নি। আমাদের মনভোলানো রুমালিরুটি কিন্তু মোঘল রাজা বাদশাহরা খেতেন না, খাওয়াদাওয়া সমাপ্তি হাত মুখ মোছার জন্য জন্ম হয়েছিল রুমালি রুটির। অবাক হবার কিছুই নেই। রাজা বলে কথা!!

যা বাবা বলতে তো ভুলেই গেছি শিশুদের ইস্কুলে কিন্তু রুমাল বাধ্যতা মূলক। তাহলে রুমাল সর্বত্রগামী। মানুষ যেখানে রুমাল সেখানে।

আধুনিক বিশ্বে রুমালের নাম পদবি ও ব্যবহার পাল্টেছে। উনি কখনও টিসু, ফেসটিসু, বাথ টিসু, ন্যাপকিন, স্যাচেট ইত্যাদি নামে মর্যাদা পেয়েছেন। আধুনিক হতে সকলেরই তো সাধ জাগে রুমালেরই বা দোষ কি!! তবে রুমাল কিন্তু মার্জিত বলেই মনে হয়।

বেশ তা হলে জাদুকরের জাদুর স্পর্শে রুমাল খেল দেখাতে দেখাতে বেড়াল বের করেই দিলো। জাদু করের শিল্পে রুমাল উপহার দেয় অনেক কিছু।

লেখকের পরশে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হলো রুমালের।

প্রোপোজাল

সমর মুখোপাধ্যায়

দুদিকে দুটো কাগজের গোছা। মাঝখানে বসে সুতপা একবার এদিকে দেখছে, একবার ওদিকে। কাগছের গোছা দুটো আসলে দুটো প্রোপোজাল, গত দুমাস ধরে অবিশ্রান্ত কাজ করে সুতপা শেষ করেছে এই দুটো। এখন জমা দেবার কথা। দুমাস আগে ওর MSc র রেজাল্ট বের হয়। খুব ভাল রেজাল্ট করেছে। ওর প্ল্যান হচ্ছে একটা এক বছরের রিসার্চ ফেলোশিপ নিয়ে কাজ করবে, অভিজ্ঞতাও হবে, আর পি এইচ ডি র কাজও এগিয়ে থাকবে। কিন্তু ফেলোশিপ পেতে হলে একটা প্রোপোজাল লিখে জমা দিতে হবে দুমাসের মধ্যে। সেই দুমাসের জন্য একটা স্পেশাল গ্রান্ট পেতে হবে। তাই রেজাল্ট বেরোবার পরের দিনই স্যারের সঙ্গে দেখা করতে গেছিল সেই গ্রান্টের ব্যাপারে। সেখানেই সেই অদ্ভুৎ ব্যাপারটা ঘটেছিল যার কোন ব্যাখ্যা ও এখনও পায় নি।

স্যার এর অফিসে যখন পৌঁছাল তখন সন্ধ্যে হয় হয়। একটা লম্বা করিডরের শেষ প্রান্তে স্যার এর অফিস। দূর থেকে সুতপা দেখল একটা লোক, ষ্টুডেন্ট ই হবে বোধ হয়, স্যার এর অফিস থেকে বেরিয়ে করিডর দিয়ে এই দিকেই আসছে। তার মানে স্যার অফিসেই আছেন। তবুও ছেলেটি যখন কাছাকাছি এল তাকে জিজ্ঞেস করল, "স্যার কি অফিসে আছেন?" কোন উত্তর না দিয়ে, যেন শুনতে পায় নি, পাশ দিয়ে চলে গেল। "কি ডাঁটিয়াল লোকরে বাবা", সুতপা ভাবল। স্যার এর অফিসে গিয়ে দেখল অফিস তালাবন্ধ। যাঃ বাবা, লোকটা বেরুলো তো এই ঘর থেকে। পেছন ফিরে তাকে আর দেখতে পেলো না। উবে গেলো নাকি? যাক গে। এই নিয়ে সুতপা আর বেশী মাথা ঘামায় নি। কিন্তু কোন ব্যাখ্যাও পায় নি। যাই হোক, সুতপা পরে স্যার এর সঙ্গে দেখা করে গ্রান্ট জোগাড় করেছে। পরের সপ্তাহ থেকেই কাজ শুরু করে দিয়েছে ল্যাব এ গিয়ে। একটা ডেস্ক পেয়েছে, সঙ্গে একটা ফাইল ক্যাবিনেট, আর

কিছু টুকটাক জিনিস। ল্যাবের সিনিয়াররা ওকে খুব উৎসাহ দিয়েছেন। "তোমার কিছু দরকার লাগলে বোলো, আমরা তো আছিই"। কিন্তু সব দূর থেকে। সুতপা অবাক হত, ওর ডেস্কের কাছে কেউ আসতো না। কেন কে জানে। ঠিক আছে, ওদের যা ইচ্ছে।

দিনরাত কাজ করে সুতপা একটা নয়, দুটো প্রোপোজাল লিখল, প্রোপোজাল "A" আর প্রোপোজাল "B", একেবারে ভিন্ন বিষয়ে। প্ল্যান ছিল যেটা বেশী ভালো মনে হবে সেটা জমা দেবে। এখন সময় এসেছে ঠিক করার। ওর নিজের বেশী পছন্দ প্রোপোজাল "B"। সুতপা ঠিক করল সেদিন আর চিন্তা করবে না, প্রোপোজাল দুটো ড্রয়ারে তালাবন্ধ করে বাড়ী চলে যাবে, কাল এসে একটা জমা দেবে, কালই লাষ্ট ডে।

সারারাত ঘুম হল না, কিছুই ঠিক করতে পারছে না। সকালে অফিসে এসেও ভাবছে। ড্রয়ার খুলে বার করল প্রোপোজাল দুটো। এ কি! এ কি হল? এখানে তো একটাই প্রোপোজাল! তন্ন তন্ন করে খুঁজেও দেখল প্রোপোজাল "B" নেই। অথচ, গতকাল নিজের হাতে ড্রয়ারে রেখে তালাবন্ধ করে চাবি বাড়ী নিয়ে গেছে। ওর মুখচোখের অবস্থা দেখে কয়েকজন সিনিয়ার দাদা দূর থেকে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে সুতপা?" সব শুনে ওরাও কিছুক্ষন মুখ চাওয়া চাওয়ি করে বলল, "কি আর করবে। যেটা রয়ে গেছে সেটাই জমা দিয়ে দাও"। বাধ্য হয়ে সুতপা প্রোপোজাল "A" টাই জমা দিয়ে দিল।

পরের সাতটা দিন খুবই টেনশানের মধ্যে গেল। তিন জন প্রফেসারের একটা প্যানেল ওর প্রোপোজালটা খুঁটিয়ে দেখেছেন। সাতদিনের দিন ওঁরা সুতপাকে ডেকে পাঠালেন। দুরু দুরু বুকে সুতপা কনফারেন্স রুমে পৌঁছুল। চেয়ার প্রফেসার ওকে বসতে বলে বললেন, "আমরা তোমার প্রোপোজাল খুব মন দিয়ে সবাই দেখেছি। তবু তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই। সংক্ষেপে তোমার প্রোপোজাল সম্বন্ধে বল।" সুতপা যতটা পারে নিজের কাজটা পুরোটা প্রেজেন্ট করল। সব শোনার পর চেয়ার বললেন, "আমরা আগেই ডিসিশন নিয়েছি। কনগ্র্যাচুলেশনস। তোমার প্রোপোজাল আমরা accept করেছি। তুমি পরের সপ্তাহ থেকেই কাজ শুরু করে দাও। All the best। সুতপা অভিভূত, ওর চোখ জলে ভরে যাচ্ছিল। হঠাৎ চেয়ার বললেন, "শোন সুতপা, আমরা শুনেছি, তুমি আর একটা প্রোপোজাল লিখেছিলে আর সেটা হারিয়ে গেছে। আমরা তো অবাক। লোকে একটা প্রোপোজাল লিখতেই হিমসিম খেয়ে যায়, আর তুমি দু দুটো লিখে ফেললে। আচ্ছা, বলো তো, ওই প্রোপোজালটাতে কি ছিল?" সুতপা বলল, "স্যার, অনেক খেটে ওই প্রোপোজালটা লিখেছিলাম, আর ওইটাই আমার ফেভারিট ছিল। "ওর যতটা মনে ছিল, সবটা বলে গেল। তিনজন প্রফেসার একেবারে চুপ। তারপর কিছুক্ষন নিজেদের মধ্যে নীচু গলায় কিছু আলোচনা করলেন। তারপর চেয়ার বললেন, "সুতপা তুমি জানো তুমি কি করতে চলেছিলে? তুমি যে কেমিক্যাল গুলোর মিশ্রন তৈরী করতে আর তার মধ্য দিয়ে কারেন্ট পাশ করাতে, তাতে এত বড় একটা বিষ্ফোরণ হত, তুমি তো যেতেই, এই ল্যাবও থাকত না। যে তোমার প্রোপোজালটা সরিয়েছে, সে তোমার খুব উপকার করেছে। যাই হোক, এখন যে প্রোজেক্টটা appove করা হয়েছে, সেটা মন দিয়ে কর"।

অদ্ভুত একটা mixed feeling নিয়ে কনফারেন্স রুম থেকে বেরোল সুতপা। ভীষণ আনন্দ হচ্ছে প্রোপোজালটা এত প্রশংসা পেয়ে পাশ হয়েছে। আর যেটা ওর ফেভারিট ছিল, সেটা বেরোল এত di-sastrous। যাই হোক, সবার কাছ থেকে congrats পেল, স্যারও খুব খুশী। কাজও পুরোদমে শুরু করে দিলো। কিন্তু সিনিয়াররা এখনো ওর ডেস্কের কাছাকাছি আসে না। দূর থেকেই কথা বলে। মাস ছয়েক কেটে গেল। প্র্যাক্টিক্যাল কাজ খুব ভাল এগোচ্ছে। থিয়োরীটাও চলছিল ভাল। কিন্তু একটা থিওরেম, যেটা ওর প্রোজেক্টের সব থেকে ইম্পর্ট্যান্ট, সেটাই প্রুভ করতে পারছে না। তিনপাতা অঙ্ক কষে বসে আছে। আর এগোচ্ছে না। পুরো লিটারেচার ঘেঁটে মনে হচ্ছে এর কোন সল্যুশানই নেই। প্রচন্ড নিরাশ হয়ে পড়ল সুতপা। তার মানে আর এগোতে পারবে না। তাহলে কি এখানেই ইতি পড়বে কাজের? সারা weekend বাড়ীতে বসেই ভাবল, ল্যাবে গেলই না। গুম হয়ে থাকল, খাওয়া দাওয়াও ঠিক মত করলো না। সব কিছু কি শেষ হয়ে গেলো?

সোমবার ল্যাবে গিয়ে, ড্রয়ার খুলে খাতাটা বের করল। নিজের তিন পাতা deduction টা আবার দেখলো। আর একবার কি চেষ্টা করবে? নাকি ছেড়ে ছুড়ে বাড়ী চলে যাবে? কিন্তু এ কি? এটা কি হল? নিজের তিন পাতা লেখার পর আরো চার পাতা লেখা কোত্থেকে এল? মুক্তোর মত হাতের লেখায় লাইনের পর লাইন deduction চলেছে। চার পাতায় পুরো প্রুফ শেষ। চোখ বুলিয়ে দেখলো একটা unique কিন্তু correct method এ প্রুফটা করা হয়েছে। এতে কোন ত্রুটিই নেই। কে করল? কি ভাবেই বা করল? আর থাকতে না পেরে একজন সিনিয়ার চিত্তদার কাছে গেল। ওর মুখচোখ দেখে চিত্তদা বলল, "এ কি? কি হয়েছে সুতপা?" সুতপা সব খুলে বলল। প্রোপোজাল "B" হারিয়ে যাওয়া, সেটা ডেঞ্জারাস প্রমানিত হওয়া, তারপর আজ এই অসম্ভব একটা প্রুফ। চিত্তদা খানিক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বললেন, "তোমাকে একটা কথা আমরা সবাই বলব বলব ভেবেও বলা হয় নি। তুমি একবার বলেছিলে না স্যারের ঘর থকে একটি ছেলেকে বেরোতে দেখেছিলে অথচ স্যারের ঘর তখন বন্ধ ছিল?" সুতপা বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই তো কয়েক মাস আগে। চিত্তদা বললেন, "তুমি সেই ছেলেটির বর্ননাও দিয়েছিলে। এসো আমার সঙ্গে"। ওকে নিয়ে গেলেন ঘরের এক কোনায় রাখা একটা আলমারীর কাছে। সেটা খুলে অনেক ফাইলপত্রের ভিতর থেকে একটা কাপড়ে জড়ানো পুঁটুলি বের করলেন। সেটা খুলতে দেখা গেল একটা ফ্রেমে বাঁধানো গ্রুপ ফোটো। "এই ফোটোটা ভাল করে দেখো। দেখতো কাউকে চিনতে পারো কি না?" সুতপা বেশ অবাক হল, তারপর ভাল করে ছবিটা দেখল। গোটা ছয়েক মেয়ে আর দশ বারোটা ছেলে। বেশ কয়েক মাস হয়ে গেছে, তবুও একজনকে চেনা চেনা লাগলো। তাকে দেখিয়ে বলল, "একেই দেখেছিলাম। চিত্তদা বললেন, "আমরা এই রকমই ভেবেছিলাম। ও হল দেবেশ, দেবেশ সাহা। আমাদের ইনষ্টিট্যুটের সব থেকে ব্রিলিয়্যান্ট ছাত্র। প্রচন্ড মেধাবী, অদ্ভুৎ সায়েন্টিফিক ইনট্যুইশান। আর অসাধারন অধ্যবসায়। কিন্তু কি ট্রাজিক। একটা প্রোজেক্ট হাতে নিয়েছিল। সব স্যারেরা বলেছিলেন ওটা ছেড়ে দাও। বিদেশেও এই প্রবলেমের কোন সল্যুশান এখনও বেরোয় নি। কিন্তু ও চেষ্টা চালিয়েই যেতে থাকল। শেষের দিকে নাওয়া খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিলো। এই ব্যার্থতা ওকে ভীষণ আঘাত দিয়েছিল। একদিন সকালে লোকজন এসে দেখে নিজের চেয়ারে বসে আছে, মৃত। ল্যাব থেকে সায়ানাইড নিয়েছিল"।

চিত্তদা একটু চুপ করে থাকলেন। সুতপা হতবাক হয়ে শুনছিল। এতো অবিশ্বাস্য এক গল্প। চিত্তদা আবার বললেন, "ওর ডেস্কেই তুমি এখন বসছ। আর, তোমার চেয়ারেই ওর বডি পাওয়া গেছিল। বুঝতেই পারছ তোমার ডেস্কের কাছে কেউ আসে না কেন। তোমাকে এই কথা এতদিন বলা হয় নি, তুমি ভয় পেয়ে যাবে বলে। অনেকে বলে ওকে এখনো কখনো কখনো ল্যাবে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। তুমি যেমন দেখেছিলে। তাছাড়া, ও তো কারো ক্ষতি করে না। তোমাকে তো ভীষণ হেল্প করেছে। তোমার ডেঞ্জারাস প্রোপোজালটা গায়েব করে তোমাকে বাঁচিয়ে দিল। আর আজ তোমার অসম্ভব প্রুফটা কমপ্লিট করে দিয়ে গেল। চিত্তদা একটু জোক করে বললেন, "মনে হচ্ছে পরলোকে গিয়ে মাথাটা আরো খুলে গেছে। কিংবা ওখানে অনেক ভালো লাইব্রেরী আছে। এখন তোমার প্রজেক্ট আর আটকাবে না। তোমার পি এচ ডি আর রোখে কে?" চিত্তদা চলে গেলেন।

সুতপা প্রায় বেঘোর অবস্থায় নিজের ডেস্কে এসে বসল। অবিশ্বাস্য একটা গল্প শুনল। আস্তে আস্তে দু হাত জড়ো করে কপালে ঠেকাল। অস্ফুটে বলল, "দেবেশদা, তুমি আর এই লোকে ঘোরাফেরা কোরো না। তোমার আত্মার শান্তি হোক। তুমি এখানকার মায়া ত্যাগ করে নিজের জায়গায় চলে যাও। ওম শান্তি"।

বসন্ত

উমা ঘোষ

দে দোল, দে দোল, আকাশে বাতাসে বাজে মাদল
এলো বুঝি বসন্ত? চারদিকে শুধু সবুজের ঢল্!
যে দিকে তাকাই, শুধুই দেখি, পলাশে রাঙা পৃথ্বীতল
আমরা মেতেছি রঙের খেলায় প্রবীণ আর নবীন দল।
শীতের রুক্ষতা শেষে, বসন্ত এনেছে রঙের বাহার
আকাশে বাতাসে খুশিতে মজেছে এ সংসার।
একটু শীত একটু উষ্ণতা, বইছে মৃদু মন্দ হাওয়া
প্রকৃতির হাতছানি সুন্দরের মাঝে হারিয়ে যাওয়া;
বাহারি ফুলের ঘনঘটা আর ভ্রমরের গুঞ্জন;
কোকিলের কুহু রব বসন্তেরই গুণকীর্তণ।
পূর্ণিমা রাতে স্নিগ্ধ চাঁদের শোভা করে মনোমুগ্ধ
আমরা সব প্রেমিকের দল তাতেই বিমুগ্ধ।
ওই পাহাড়ের ঢলে চলে দেখি বিহুর নৃত্য;
আমরা বলি, চলুক এ রঙের খেলা, নব নিত্য।
সাতরঙা এ পৃথ্বীর আনন্দ, নিয়ে লুটে পুটে
নমি তাই নতশিরে এ সৃষ্টির স্রষ্টাকে, করপুটে।

বিস্মৃত রত্ন

শুচিতা দাসগুপ্ত।

রবীন্দ্র-ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবীর আত্মকথা পড়ায় মগ্ন ছিলাম। মনোযোগ আটকাল লেখার একটি অংশে এসে।লেখিকা তাঁর ননদ প্রসন্নময়ীর প্রসঙ্গে লিখছেন—

[বড়ো মেয়ে প্রসন্নময়ী দেখতে সুন্দরী ছিলেন, এবং ভাইদের সঙ্গে থেকে তিনি বাংলা লেখাপড়া বেশ শিখেছিলেন। তিনি নিজে লিখতেও পারতেন। নবীন সেন প্রভৃতি তখনকার লেখকদের সঙ্গে তাঁদের বেশ মেলামেশা, আলাপ-পরিচয় ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রামতনু লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি কৃষ্ণনগরের তদানীন্তন বঙ্গ ভদ্র-পরিবারের সঙ্গেও বিশেষ ঘনিষ্টতা ছিল।]

তথ্যটি জানার পরে কিঞ্চিৎ আগ্রহ জন্মাল এই বিশেষ মানুষটিকে নিয়ে। শুরু হল বিষয়টি নিয়ে আরও একটু গভীরে খোঁজার পর্ব। পরিশেষে আশ্চর্য হলাম। কত অজানা নারী তাঁদের প্রজ্ঞা আর প্রচেষ্টার ডালি নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে আছেন আজও। হয়ত প্রসন্নময়ী তাঁদেরই একজন। তাই, আজ হয়ত ফিরে দেখাই যায় সে জীবনের খন্ডচিত্রকে।

পূর্বতন রাজসাহী ও অধুনা পাবনা জেলার হরিপুরে আনুমানিক ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে জন্ম হয় প্রসন্নময়ীর। পিতা দুর্গাদাস চৌধুরী, মাতা মগ্নময়ী দেবী। স্যার আশুতোষ চৌধুরী এবং সত্যেন্দ্র-জামাতা সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী প্রসন্নময়ীর সহোদর। শৈশব থেকেই প্রসন্নময়ীর বিদ্যাচর্চার সূচনা পিতা দুর্গাদাস চৌধুরীর কাছে। পরে তাঁকে ইংরাজী ও গীতবাদ্য শেখানোর জন্য নিযুক্ত করা হয় এক মেমসাহেব শিক্ষয়িত্রীকে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শহর কলকাতা থেকে দূরবর্তী বাংলায় নারীশিক্ষার এমন উদ্যোগ গ্রহণ, যথেষ্ঠ সাহসিকতার পরিচয়বাহী। আবার একই সঙ্গে প্রচলিত সামাজিক প্রথাকে নিত্যদিনের জীবনে অগ্রাধিকার দিয়ে বংশের নিয়মানুসারে প্রসন্নময়ীর বিবাহ দেওয়া হল মাত্র দশবছর বয়সে। পাত্র পাবনার গুণাইগাছার কুলীনশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকুমার বাগচী। পরিতাপের বিষয়, বিবাহ সুখের হল না। ইন্দিরাদেবী এ প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন—

[... জাতিরক্ষার খাতিরে পিসিমারা দশ বছর বয়সে কৃষ্ণকুমার বাগচী নামক এক পাড়াগাঁয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে বিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু ঠাকুরঝি সে গুনাইগাছা গ্রামে গিয়ে ঘর করতে পারলেন না, আর জামাইবাবুরও কিছুদিন পরে মস্তিষ্ক বিকার হল...]

বিবাহিত জীবনে প্রসন্নময়ী তাই স্বামীর সঙ্গে বাস করেছেন মাত্র দুইবছর, তারপর চিরকালের জন্য তাঁকে ফিরে আসতে হয় পিতৃগৃহে। অত্যন্ত চমকপ্রদ বিষয় হল, এক্ষেত্রে তাঁর জীবন কিন্তু থমকে গেল না, বিশেষত বৌদ্ধিকচর্চার দিকটি। তাই, ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ তাঁর বারো বছর বয়সেই প্রকাশিত হল কবিতার বই আধ-আধ-ভাষিণী। এরপর থেকেই ক্রমাগত প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর কবিতাগ্রন্থ, উপন্যাস ও প্রবন্ধ। ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্ম্মবাণী, মাতৃমন্দির অন্তঃপুর, বঙ্গলক্ষ্মী প্রভৃতি সাময়িকপত্র গুলির তিনি ছিলেন নিয়মিত লেখিকা। তাঁর বাংলা গদ্য একধরনের বিশিষ্টতা বহন করে এগিয়ে যায়। জীবনের নানাদিক ধরা দিয়ে যায় তাঁর লেখায়। এরই মধ্যে মনে রাখার মত বিষয়টি হল, তাঁর রচনার মধ্যে উঁকি দিয়ে যাওয়া নারীজীবনের ছবি। এ প্রবন্ধের অতি স্বল্পপরিসরে বিষয়টির আভাস দেওয়া যাক তাঁর লেখা দুটি প্রবন্ধের সাহায্যে।

প্রথমে যে প্রবন্ধের উল্লেখ করব, সেটি--সেকালের কথা, ১৩০৮ বঙ্গাব্দে অন্তঃপুর পত্রিকায় প্রকাশ পায়। প্রবন্ধে তিনি তুলে ধরেন ১২০৮ বা তারও পূর্ববর্তী পর্বের বাংলাদেশের গার্হ্যস্থ জীবনের ছবি। সেখানে যেমন আছে পুরুষের দৈনন্দিন কর্মজীবনের চিত্র, সমভাবে বা তার থেকেও বেশি আছে নারীজীবনের যাপনকাহিনি। তৎকালীন সমাজের বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারগুলিতে গৃহিণীর দৈনিক দায়িত্ব বড় কম ছিল না। তাই, নিয়মের রজ্জুতে সে জীবনকে তাঁরা বেঁধে রাখতে বাধ্যই হতেন --

[...প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানান্তে বংশানুক্রমিক বিগ্রহ "শ্যামরায়" "মঠের শিব" এবং "মঙ্গলচন্ডী"র মন্দির প্রক্ষালন করিয়া স্বহস্তে তাঁহাদের পূজার আয়োজন করিতেন ও নিজের ইষ্টমন্ত্র জপ, পূজা ধ্যান ধারণান্তে অন্দর মহলে আসিয়া কাহার কি প্রয়োজন এবং দৈনিক আহারের ব্যবস্থা করিতেন...]

পরিবারের জ্যেষ্ঠা কন্যা, সধবা ও বিধবা মহিলাদের নিত্যকর্ম, তাঁদের দেহসৌন্দর্য বর্ণনার সঙ্গে যে বিবরণটি দিতে প্রসন্নময়ী কখনই বিস্মৃত হন না সেটি হল সেই সময়ের নারীর বিদ্যাচর্চার মনোজ্ঞ ছবি—

[সেকালের মেয়েদের মধ্যেও লেখাপড়া শিক্ষার নিয়ম ছিল। দিবাবসানে গৃহিণীরা একত্র হইলে কোনও প্রবীণা রামায়ণ ও মহাভারত অধ্যয়ন করিয়া শুনাইতেন। বধূগণ তাহা শুনিতে শুনিতে সিকা, চুলের দড়ি গাঁথা, সাঁচ কাটা ও পৈতা কাটা প্রভৃতি শিল্পকাজে রত থাকিতেন...]

একই সঙ্গে এও জানাতে ভোলেন না, যে, তিনি যে সময়ের বাংলাদেশের ছবি তুলে ধরেছেন, সেই সময়ে নারীর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বিদ্যাচর্চা ছিল না কিন্তু এও সত্য তাঁর প্রবন্ধে নারীজীবনের এই গৌণ উদ্দেশ্যকেই বর্ণনা করতে তিনি একেবারেই বিস্মৃত হন নি এবং এখানেই হয়ত তিনি স্বকালের থেকে এগিয়ে ছিলেন।

পরবর্তী প্রবন্ধ সেকাল ও একাল। প্রবন্ধাকারে এটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের অন্তঃপুর পত্রিকায়। এখানে তিনি তাঁর জীবনপর্ব ও তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের নারীজীবনের নানাদিকের তুলনাভিত্তিক আলোচনা করেন, যার মূল কেন্দ্রই এবার হয়ে ওঠে নারীশিক্ষা ও নারীজাগরণের দিকটি। নিজের বালিকাবয়সের শিক্ষাজীবনের সুন্দর ছবি যেমন উপহার দেন পাঠককে, একইসঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষা, স্বাধীনতা ও অগ্রগতির দিকটিকে অত্যন্ত ইতিবাচক ভাবে গ্রহণও করেন। তাই অক্লেশে তিনি উচ্চারণ করেন—

[নারী আজ আর গৃহের কোণে অন্ধকারে তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়াই পড়িয়া নাই—সংসারে তাহার যে অন্যান্য মহৎ কর্ত্তব্য আছে সেগুলি সম্পাদন করিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই, বরঞ্চ আনন্দ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে...]

যে মনোভঙ্গীকে সদর্থকভাবে গ্রহণ করে উঠতে পুরুষতন্ত্রের দ্বিধা থেকে গেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী, তাকেই অবলীলায় মনে মনে গ্রহণ করে সোচ্চারে প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা রাখেন নি প্রসন্নময়ী, বিশশতকের প্রথমার্ধের বাংলাদেশে। এমন নারী যে ভবিষ্যত প্রজন্ম রূপে কবি প্রিয়ম্বদা দেবীর মত সন্তান উপহার দেবেন, সেটি বোধহয় অবশ্যম্ভাবীই ছিল। তাই, এমন সময়ের থেকে এগিয়ে থাকা এমন নারীকে বোধহয় আজও নতচিত্তে স্মরণ করাই যায়।

সুস্মিতা

তপন কুমার রায়

নিউ টাউনের বত্রিশ তলার অফিসে শ্যামলেন্দু ওর বাল্যবন্ধু অজিতের সঙ্গে কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে ওদের নতুন প্রোজেক্ট নিয়ে গভীর আলোচনায় মত্ত। অজিতের মায়ের থেকে ফোন বেজে উঠতে ওদের খেয়াল হল যে ঘড়ির কাঁটা রাত দশটা পার করে দিয়েছে।

ঘরের কোনে সুস্মিতা এক মনে ল্যাপটপে কাজ করে চলেছে। মোটামুটি লেখাটা একটা জায়গায় এসে গেলে সুস্মিতা চারটে পাতা প্রিন্ট আউট নিয়ে শ্যামলেন্দুর সামনে ফেলতে ও মোটামুটি চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, আজ আর মাথা কাজ করছে না, সুস্মিতা তুমি আমাদের এটা মেইল করে দাও। অজিত, তুই এটা রাত্রে দেখে রাখিস। আমিও দেখব। কাল সকাল দশটার সময় এটা ফাইনাল করে সাবমিট করে দেব। এখন গুটিয়ে নেয়া যাক।

যে যার জিনিস গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়লে অজিত সুস্মিতাকে বলে, হ্যাঁ রে তোর লাঞ্চ বক্স নিবি না? কাল খাবার আনবি কি করে? তোর তো আবার ক্যান্টিনের খাবার সহ্য হয় না।

উফ রাঙ্গাদা ঠিক সময়ে মনে পড়ালে। নাহলে কাল বিপদে পড়তে হত বলে নিজের কেবিন থেকে লাঞ্চ বক্স আর অন্য টুকিটাকি জিনিস নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল।

সুস্মিতা অজিতের মাসতুতো বোন। ওরা শিবপুরে থাকে। শ্যামলেন্দু বলল, সুস্মিতা তোমাকে আমার গাড়ি পৌঁছে দেবে। অজিত আমাকে নামিয়ে দেবে।

সুস্মিতা বলে, স্যার আমি ঠিক ক্যাব পেয়ে যাব। আপনারা এত ট্রাবল নেবেন না।

বেশি পাকামি মারতে হবে না। বড়দের কথা শুনতে হয়।

উত্তরে সুস্মিতা বিড়বিড় করে বলে, স্যার এমন ভাবে কথা বলছে যেন আমার চেয়ে কত বড়। রাঙ্গাদা বলেছে শ্যামলেন্দুকে অফিসে খোকাদা আর তুমি বলে সম্বোধন না করে স্যার আর আপনি বলতে। ও সেটা খুব ভাল ভাবে মেনে চলে। যদিও ওর রাঙ্গাদাকে অন্যদের সামনে ভাববাচ্যে কথা বলে।

এরপর আর কথা না বাড়িয়ে তিনজনে করিডর ধরে নিজের নিজের ড্রাইভারকে গেটের সামনে গাড়ি আনতে বলে লিফটের দিকে এগিয়ে গেল।

শ্যামলেন্দু কানপুর আইআইটি থেকে ইলেকট্রনিক্স করে হার্ভার্ড থেকে এম বি এ করে বছর খানেকের ওপর কাজ করে দেশে ফিরে পারিবারিক কন্সট্রাকশান ব্যবসায় যোগ দেয় মূলত দাদুর উৎসাহে। তখন ওর বন্ধু বান্ধবরা প্রায় সবাই আমেরিকার গ্রিন কার্ড নিতে ব্যস্ত।

দাদু সোমেশ্বর সান্যালের তৈরি সান্যাল কন্সট্রাকশান কোম্পানির রোজগার থেকে সস্ত্রীক ছেলেকে নিয়ে নদীয়া জেলার নিজেদের পারিবারিক সম্পত্তি ছেড়ে সংসার পেতে ছিলেন দক্ষিণ কলকাতার যতীন দাস রোডের ছ কাঠা জমির ওপর একটা দোতলা বাড়ি করে। তখন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে। বেয়াল্লিশের আন্দোলন সলতে পাকাচ্ছে। কলকাতার জমির দাম আর বাড়ি তৈরির জিনিসের দামও সস্তা। পাড়াতেই তীর্থপতি স্কুলে ছেলেকে ভর্তি করে দেন। ওর পড়াশোনা আর সংসার ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামাতেন ওঁর স্ত্রী শীলা। কাজের সুত্রে সোমেশ্বরকে বার কয়েক কোলকাতায় আসা যাওয়া করতে হয়ে ছিল বলে ওর ডালহৌসি পাড়া আর মেসে থাকার দরুন শ্যামবাজার, কলেজ স্ট্রিট পাড়া খানিকটা চেনা ছিল। তবে ওদের দুজনেরই কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চল একেবারেই অজানা। কাজে ব্যস্ত থাকায় গিন্নী শীলার ওপরেই ভার পড়ল বাজারহাট চেনা আর তার সঙ্গে প্রতিবেশী যে দু-এক ঘর ছিল তাদের সঙ্গে আলাপ জমানো। তাদেরও বেশীরভাগই ছিল যশোর খুলনা ইত্যাদি অঞ্চল থেকে।

স্কুলের পাট চুকিয়ে বিমলেন্দু বি ই কলেজ থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং করল বাবার কথামত এই ভেবে যে ও ভবিষ্যতে বাবার ব্যবসার হাল ধরবে। কিন্তু ও পাস করেই কলকাতার এক বড় সংস্থায় চাকরি নিয়ে নেয়। বাবার ব্যবসায় কিছুতেই যোগ দেয় না। ও বলে, বাড়িতেই অফিস হলে সারাদিন বেরনো যাবে না। এদিকে ওর মা বলতে লাগলেন, বিয়ে দিয়ে দাও। বৌ এসে বোঝাবে। ওরা ঘটক মারফৎ দেখা শোনা করে ওর বিয়ে দিয়ে দেন। ওর এক পুত্র সন্তান শ্যামলেন্দু জন্মায় যখন দেশ বেশ কিছুদিন হল স্বাধীন হয়ে গেছে আর দেশ ভাগ হয়ে গেছে। সোমেশ্বরের নাতি দাদুর খুব প্রিয় ছিল। দাদু ওকে খোকা বলেই ডাকত।

খোকা পড়াশোনার সঙ্গে খেলাধুলোতেও তুখোড় ছিল বলে স্কুলের মাস্টারমশাইদের কাছে প্রিয় ছিল। স্কুলের অনেক বন্ধু হয়েছিল। তবে তার মধ্যে ওর ক্লাসের অজিত ছিল বেশি ঘনিষ্ঠ। স্কুলের উল্টোদিকে দেশপ্রিয় পার্কে ক্রিকেট ফুটবল দুটোই হত। পড়াশোনায় অজিত একটু পেছনে থাকত কিন্তু ফুটবলে সেন্টার ফরোয়ার্ড আর ক্রিকেটে ওপেনিং ব্যাটসম্যান আর ফাস্ট বোলার হওয়ার দরুন ও মাস্টারমশাই ও ছাত্র মহলে বেশি জনপ্রিয় ছিল।

ততদিনে সোমেশ্বরের ব্যবসা ক্রমশ ফুলে ফেঁপে উঠেছে। আর

ওদিকে শ্যামলেন্দু আর অজিতের স্কুল ফাইনাল শেষ হলে দুজনেই সেন্ট জেভিয়ারস এ বিজ্ঞান নিয়ে ইন্টারমিডিয়েট এ ভর্তি হল। শ্যামলেন্দু স্কুল বোর্ডের ফার্স্ট ডিভিশনের ওপর দিকের রেজাল্ট নিয়ে আর অজিতের ফার্স্ট ডিভিসানের নীচের দিকে থাকায় স্পোর্টস কোটা তে ভর্তি হল। দেখতে দেখতে দু বছর কেটে গেলে শ্যামলেন্দু জয়েন্ট দিয়ে আই আই টি কানপুরে ইলেকট্রনিকস আর অজিত কলেজে বি এস সি তে ভর্তি হল অঙ্কে অনার্স নিয়ে। এই প্রথম দুই বন্ধু আলাদা হল। কানপুর যাবার আগের দিন শনিবার শীলা অজিতের বাবামাকে দিনের বেলা খাবার নেমন্তন্ন করেছিল। শীলা দু ডজন পোস্টকার্ড নিয়ে দুজনকে বারটা বারটা করে দিল আর বলে দিল প্রতি হপ্তায় যেন বন্ধুরা পরস্পরকে একটা করে চিঠি দেয়। দেখতে দেখতে ষাটের দশকের শুরুতে চারটে বছর পার হয়ে গেলে এক বন্ধু কানপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং করে স্কলারশিপ নিয়ে হার্ভার্ড যাবার প্রস্তুতি নিল আরেক বন্ধু কোলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে এম এস সি করে ওখানেই রিসার্চ করার সুযোগ পেল। এদিকে সোমেশ্বর ব্যবসা বাড়িয়ে দিল্লি আর অন্যান্য শহরে কাজ নিল। বাড়িটাও তিনতলা করে নীচের তলাটা পুরো অফিসের জন্য ব্যবহার করা শুরু করল। তাতেও স্থান সংকুলান হয় না। নিজেরা দোতলায় থেকে ছেলে বিমলেন্দু দের তিন তলায় পাঠিয়ে দিলেন। তবে শীলা রান্না ঘর দো তলাতেই রাখলেন।

খোকা বছরে একবার কলকাতায় আসত। ওর মা ওর প্রিয় খাবার তৈরি করে আমেরিকার গপ্প শুনত। বাবা এমনিতেই খুব স্বল্পবাক ছিলেন। টিভি খুলে খবর দেখতেন আর একটার পর একটা চা আর তার সঙ্গে একটা করে সিগারেট খেয়ে সময় কাটাতেন। মাঝে মাঝে মায়ের বকুনি এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দিতেন। খোকার মন পড়ে থাকত দাদু কাজ সেরে কতক্ষণে দোতলায় উঠবেন। দাদুর দেরি হলে খোকা এক তলায় দাদুর অফিসে হানা দিত। দেখত প্রায় ফাঁকা অফিসে দাদু মনোযোগ দিয়ে মোটা মোটা লাল রঙের খাতাতে কি সব দেখছেন। কখনও কখনও হাঁক পেড়ে কাউকে ডেকে খাতার থেকে কিছু ব্যাপার নিয়ে জিজ্ঞেস করতেন। অফিসের একজন ইঞ্জিনিয়ার যাকে খোকা কয়াল জেঠু বলে ডাকত খোকাকে খুব ভাল বাসতেন। উনি দাদুর খুব ভরসার মানুষ ছিলেন।

ও হে কয়াল, আজ দাদুভাই আর কাজ করতে দেবে না। সব গুটিয়ে নাও। কাল রোববার, তুমি সকাল সকাল একবার এস ঘণ্টা খানেকের জন্য। দিল্লি সাইটের একাউন্টস ফাইনাল করে নেব। দাদুভাইকে বলব তোমার জন্য ব্রেকফাস্টে আমেরিকান স্যান্ডউইচ আর কফি বানাতে। বদ্রিকে বল অফিস বন্ধ করতে।

খোকা দাদুর সঙ্গে ওপরে আসতে ঠাম্মা বলল, শেষ পর্যন্ত নাতির হাতে জব্দ হয়েছ। খেয়াল আছে কটা বাজে? খোকা, যা দেখি বাবা মাকে ডেকে দে। বলিস ঠাম্মা খেতে ডাকছে। খেতে খেতে খোকা দাদুর কাছে শুনতে লাগল বিভিন্ন সাইটে কি ধরণের কাজ চলছে। সব শুনে বলল, জান দাদু আমেরিকাতে এখন কন্সট্রাকশান ম্যানেজমেন্ট বলে নতুন কনসেপ্ট হয়েছে। এখানে মনে হয় এ সম্বন্ধে কেউ জানেনা। কাল সকালে তোমাকে ডিটেলে বলব।

দাদুভাই, আমার তো প্রায় আশি হয়ে গেল। তুই আমাকে না বুঝিয়ে নিজেই সান্যাল কন্সট্রাকশানের ভার নে না। বিদেশে তো প্রায় দু বছর কাজ করলি। তোর বাবারও রিটায়ার করার সময় হয়ে এল।

দেখতে দেখতে ছুটির পনেরোটা দিন কোত্থেকে কেটে যেতে লাগল। ফেরার আর পাঁচটা দিনও নেই। এর মধ্যে একদিন স্কুলের বন্ধু অজিতের সঙ্গেও অনেক কথা হল। অজিত ডক্টরেট থিসিস শেষ করার আগেই একটা কোম্পানির অফার পেল মোটামুটি ভাল মাইনেতে। তখন দেশে সবে সবে কম্পিউটার এসেছে। বেশীরভাগ বেসরকারি সংস্থায় হাতে না লিখে আকাউন্টস আর চিঠিপত্র কম্পিউটারেই হত। দুই বন্ধুতে এসব নিয়ে অনেক আলোচনা হল। খোকার মাথায় দাদুর কথামত সান্যাল কন্সট্রাকশান কে নতুন রূপ দেবার প্ল্যান খেলতে লাগল। খোকা বলল, দাদুর খুব ইচ্ছে ওঁর ব্যবসা চালিয়ে যেতে হবে। তবে এই সেকেলে ব্যবস্থায় চালানো অসম্ভব। আমি একা তো পারব না। তুই আমার সঙ্গে পার্টনারশিপ করবি? এখানে তো আমার সেরকম জানাশোনা নেই। দাদুর কোম্পানির বেশীরভাগ লোকেরই বয়স হয়ে গেছে। ইঞ্জিনিয়ার থেকে আর্কিটেক্ট আর অফিস স্টাফ সবই নতুন লাগবে। আর বাড়ির একতলায় পুরনো অফিসে মডার্ন লুক দেয়া যাবে না। কলেজের মানস গুপ্তকে মনে আছে? ও রাজারহাটে ওর নতুন ফ্ল্যাটে নেমন্তন্ন করেছিল। জায়গাটা একটু দেখলাম। একটু দূরে একটা হাই রাইজ কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স তৈরি প্রায় শেষের মুখে। ওর উঁচু তলায় একটা ফ্লোর বেশ পছন্দ হল। চার তলায় একটা ক্যানটিন ফ্লোর আর তার সঙ্গে নিচের দুটো ফ্লোর পারকিং। পঁয়ত্রিশ তলায় আট হাজার স্কয়ার ফিট পাঁচ কোটি চাইছে। ওদের সঙ্গে দরাদরি করে এডভান্স দিয়ে সান্যাল কন্সট্রাকশান এর নামে বুক করে নে। আমি ফিরে গিয়েই দাদুর কোম্পানিতে টাকা ট্রান্সফার করে দেব। তবে তার আগে সান্যাল কন্সট্রাকশান কে লিমিটেড কোম্পানি করতে হবে। দাদুর সঙ্গে অবশ্যই কথা বলে নেব। আর এই সঙ্গে নিচের তলা খালি হলে মায়ের একটা গানের স্কুল খোলার সাধ পূর্ণ হবে। সব শুনে অজিত খুব উৎসাহ নিয়ে বলল, কিন্তু পার্টনারশিপের অত টাকা আমি কোথায় পাব?

- ভেরি সিম্পল। প্রথম দিকে পেড আপ ক্যাপিটাল কম থাকবে। দরকার পড়লে তুই আমার থেকে ধার নিবি, পরে লাভের টাকা থেকে আস্তে আস্তে শোধ করে দিবি। নে চ পার্ক স্ট্রীটের Trinca তে সেলিব্রেট করি।

- না রে আমার যাওয়া হবে না। আমার মাসতুতো বোন সুস্মিতা আমাদের ওখানে আসবে।

- ওকে ডেকে নে না। মাসতুতো বোন মানে সেই পুঁচকে তো?

- না রে, ও আর পুঁচকে নেই। আমাদের থেকে কতই বা ছোট? আট ন বছর ছোট হবে।

- তাহলে ডেকে নে। তোদের বাড়ি তো পার্ক স্ট্রীটের থেকে বেশি দূর নয়।

অজিত মুখের ওপর না বলতে পারল না। পুঁচকে, অজিত আর শ্যামলেন্দু রেসুরেন্টে একটা চারজনের টেবিল নিয়ে বসল। পুঁচকের পাশে শ্যামলেন্দু আর উল্টোদিকের চেয়ারে অজিত। কে কি খাবে ঠিক করে অর্ডার দিয়ে ওরা গুছিয়ে বসে শ্যামলেন্দু বলল, কি রে পুঁচকে কেমন আছিস? তোকে জিন্স আর শার্ট পরে বেশ বড় বড় দেখাছে।

- দ্যাখ খোকাদা, আমার ভাল নাম সুস্মিতা। পুঁচকে বলে ডাকবে না। আমি আর ছোট নেই। আমি কম্পিউটার সায়েন্সে ডিপ্লোমা করে একটা একাউন্টস ফার্মে অডিট ডিভিশনে কাজ করি। আজ ছুটি ছিল বলে ছোট মাসী খেতে ডেকেছিল। মাঝখান থেকে রাঙ্গাদা আর তুমি সব গুবলেট করে দিলে।

খাবার খেতে খেতে সুস্মিতা শুনল রাঙ্গাদা আর খোকাদা কি সব ব্যবসার আলোচনা করছে। খাওয়া শেষ হলে সুস্মিতা বলে উঠল, আমাকে তোমাদের নতুন অফিসে একটা কাজ দেবে? জান তো খোকাদা, এখন এখানেও Z কে Zee বলা শুরু হয়েছে তোমাদের অ্যামেরিকার মত।

পুঁচকের কথা শুনে শ্যামলেন্দু হেসে উঠে বলল, তুই আমাদের কোম্পানিতে যোগ দিলে মাঝে মাঝে অ্যামেরিকা যেতে হলে পারবি তো? নাকি বাড়ির পছন্দ করা পাত্রের গলায় মালা দিয়ে হেঁসেল ঠেলবি? সুস্মিতা ওর কথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে বলল, খোকাদা, আমাকে দেখে তোমার কি সেই ধারণাই হল?

বিল মিটিয়ে তিনজনে গাড়ির কাছে এসে ঠিক করল, সবাই শ্যামলেন্দুদের বাড়ি যাবে বিকেলে চায়ের আসরে আরও বিস্তারিত আলোচনা করতে দাদুকে সামনে রেখে।

আলোচনা চলা কালীন দাদু দুএকটা প্রশ্ন করলেন। উত্তর শুনে খুশি হয়ে সুস্মিতাকে প্রশ্ন করলেন, দিদিভাই, তুমি কোম্পানি ল' এত জানলে কি করে? সুস্মিতা বলল, দাদু, অডিট ফার্মে বিভিন্ন ধরণের বিষয় চর্চা করতে হয়। অফিস লাইব্রেরিতে অনেক সময়ই বই ঘাঁটতে হয় কোন

বিষয় পরিষ্কার করে না জানা থাকলে।

শ্যামলেন্দু আর অজিত দুজনেই খুশি হল দাদু পুরো ব্যাপারটাতে রাজী হওয়ায়। সুস্মিতা বলল, আমার অফিসে তিন মাস নোটিশ পিরিয়ড আছে।

শ্যামলেন্দু বলে, আরে, অফিস ইত্যাদি রেডি হতেও তো মাস চার পাঁচ লেগে যাবে। তাছাড়া আমারও তো ওখানকার পাট চুকোতে ওরকম সময় লেগে যাবে। এর মধ্যে মাসে তিন চার দিন তো আমাকে আসতেই হবে। অজিত, তুই এর মধ্যে সুস্মিতার সঙ্গে পরামর্শ করে নিবি যে কোন ব্যাপার নিয়ে। ইতিমধ্যে তোরা নিজেদের পাসপোর্ট তৈরি করে রাখবি।

সময় হুড়হুড় করে কেটে গেল। শ্যামলেন্দু অ্যামেরিকার পাট প্রায় চুকিয়ে ফেলেছে। অজিত আর সুস্মিতা নিজেরা চাকরি ছেড়ে আপাতত অফিসের জন্য জনা কুড়ি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের অফিসার নিয়োগ করেছে। সান্যাল কন্সট্রাকশান প্রাইভেট লিমিটেড এর অফিস উদ্বোধন করলেন, কোম্পানির চেয়ারম্যান সোমেশ্বর সান্যাল। অজিত প্রত্যেকের সঙ্গে চেয়ারম্যানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল আর সুস্মিতা ওর পুরনো অফিসের পরিচয়ের মাধ্যমে বাংলা আর ইংরিজি কাগজের প্রেসও ডেকেছিল। ওদের ছবি তোলা ছাড়াও শ্যামলেন্দুর একটা ইন্টার্ভিউ নিল। সুস্মিতার কেরামতি দেখে শ্যামলেন্দু অজিতকে বলল, পুঁচকের কেরামতি দেখছিস? সুস্মিতা ওর খোকাদার দিকে তাকিয়ে বলল, আবার? সরি সরি, মিস সুস্মিতাকে আর পুঁচকে বলে ডাকা চলবে না।

শ্যামলেন্দু তখন হিউস্টনে একটা কোম্পানির সঙ্গে ইন্ডিয়াতে নতুন পাওয়ার প্লান্টের জন্য কন্সট্রাকশান ম্যানেজমেন্ট এর জন্য দরাদরি করে প্রায় ফাইনাল করে ফেলেছে। শুধু সই সাবুদ হওয়া বাকি। সেই মুহূর্তে সুস্মিতার একটা ফোন পেয়ে খানিকটা ঘাবড়ে গেল। ইন্ডিয়াতে তো এখন মাঝরাত। খবর পেল যে দাদু খানিকক্ষণ আগে চলে গেছেন। সন্ধ্যে বেলা খেয়ে উঠে হঠাত বুকে ব্যাথা হতে ডাক্তার আসার আগেই চলে গেছেন। শ্যামলেন্দুর মুখ চোখের চেহারা দেখে আর সব শুনে ওর মক্কেল বলে, মিস্টার সান্যাল আজই সইসাবুদ শেষ করে নিন। আপনার ক্যালকাটার ফ্লাইট এখনই ঠিক করে দিচ্ছি।

কাগজপত্র নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে সোজা এয়ারপোর্ট। কলকাতায় পরের দিন ল্যান্ডিং এর সময় সুস্মিতাকে ফোনে জানিয়ে দিল। সুস্মিতা বলল, রাঙ্গাদা পিস হেভেনে ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। ও নিজেই এয়ারপোর্টে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে।

শ্যামলেন্দু প্লেন থেকে নেমে কাস্টমস এর ফরম্যালিটি শেষ করে দেখল, সুস্মিতা বেড়ার ওপারে হাত নাড়ছে। ওকে এই প্রথম ও শাড়ি পরে দেখল। কাছে এসে বলল, তোকে কি বড় বড় দেখাচ্ছে। হাত না নাড়লে চিনতেই পারতাম না। এবার থেকে সত্যি সত্যিই আর পুঁচকে বলা চলবে না।

পিস হেভেনে দেখল বাবা মা আছেন। সঙ্গে অজিত। ঠাম্মা আসে নি, বলেছেন পঞ্চান্ন বছর যে ভাবে দেখেছি সেই ভাবেই মনে রাখতে চাই। ঠিক হল যে সেই রাতেই শেষ কাজটা সেরে নেবে। ওখানকার লোকেরা বাড়ি থেকে আনা ধুতি পাঞ্জাবী পরিয়ে দিল। দাদুর ইচ্ছে মত বুকের ওপর গীতা রাখা হল না। সব কাজ সেরে বাড়ি ফিরতে প্রায় মাঝ রাত হয়ে গেল। সুস্মিতা সারাক্ষণ ওর খোকাদাকে সঙ্গ দিয়েছে। অজিত খেয়াল রেখেছে ওর বাবা-মাকে।

দেখতে দেখতে দশটা দিন কেমন ভাবে যেন কেটে গেল। সুস্মিতা আর অজিত এর মাঝে অফিসে গিয়ে টুকটাক কাজ সেরে নিয়েছে। শিবপুর থেকে যাতায়াতের সময় বাঁচাবার জন্য সুস্মিতা এই কদিন ওর খোকাদার বাড়িতেই থেকে গিয়েছিল। শ্যামলেন্দু তিন দিনের মাথায় ওর দাদুর ঘরে ঠাম্মার কোলে মাথা রেখে ভেঙে পড়ে। ওর বাবা মা পর্যন্ত খোকাকে কবে শেষ কাঁদতে দেখেছে মনে করতে পারল না। ঠাম্মা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। শ্যামলেন্দু হঠাত খেয়াল করল ওর দু কাঁধে নরম হাতের ছোঁয়া দিয়ে সুস্মিতা বলছে, খোকাদা এই সরবতটা খেয়ে নাও। হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা নেবার সময় শ্যামলেন্দু খেয়াল করল, সুস্মিতা ওকে আগের মত তুমি বলে সম্বোধন করছে। সুস্মিতাকে আটপৌরে করে শাড়ি পড়ে বেশ গিন্নি গিন্নি দেখাচ্ছে।

ঠাম্মি বলল, সুস্মিতা খোকাকে তুমি ওই ঘরে নিয়ে যাও। ওকে বল, দাদু নেই কে বলল? ওকে বল এরকম কাঁদতে দেখলে খুব দুঃখ পাবেন। সুস্মিতার সঙ্গে দোতলার গেস্ট রুমে এসে শ্যামলেন্দুর নিজেকেই কেমন যেন গেস্ট বলে মনে হল।

সোফায় পাশাপাশি বসে শ্যামলেন্দু সুস্মিতার হাতে হাত রেখে বলে পুঁচকে, এই প্রথম তোর ওপর যেন কত ভরসা করতে ইচ্ছে করছে। তুই আমাকে ভরসা দিবি তো?

সুস্মিতা কোন কথা বলল না। মুখ নিচু করে নিজের আরেকটা হাত দিয়ে ওর খোকাদার আরেকটা হাত টেনে নিল।

সেতু

বিশ্বনাথ পাল

সেতু ভেঙে যায়
হয়তো কালের নিয়মে বা অযত্নে অবহেলায়
সেতু ভেঙে যায়.....

দৃশ্যমান সেতুর ভাঙন সবার চোখে পড়ে
আগ্রাসনে পরছে ভেঙে দেশে-দেশান্তরে
অহংকারী রাষ্ট্রনায়ক তুঘলকি সব রাজা
লুটে পুটে খাচ্ছে সবই, খাজা হোক বা গাজা
চাইলে আবার নতুন করে গড়িয়ে তারা নেবে
লাভের গুড় ঘুরেফিরে সেই রাজারাই খাবে
কিন্তু যত সেতুর বাঁধন ভাঙছে অগোচরে
ভেবেছ সেই সেতুর ভাঙন রুখবে কেমন করে?

প্রযুক্তি আজ দুরের সবই এনেছে ঘরের দোরে
ব্যবধান তবু তোমাতে আমাতে দিনে দিনে যায় বেড়ে
একা বসে থাকা ড্রয়িং রুমেতে পৃথিবীকে নিয়ে হাতে
তবু সুখ-দুখের কথা বলবার বন্ধু নেইত সাথে
ক্ষুদ্র স্বার্থ আর কেবলই লাভের হিসেব গুনে
ঠুলি পরে বসে থাকা তাই একলা ঘরের কোনে
স্নেহ - ভালবাসা – সহমর্মিতা – সহিষ্ণুতা যতো
ফিকে হয়ে আসে দিনে দিনে যেন ধূসর ছবির মতো
জাতি – ধর্ম – বর্ণ আরও হাজারো বিদ্বেষে
হিংসার কোপে ভাঙছে সমাজ তোমার আমার দেশে

ভাঙা গড়ার খেলা সেতো ছিলই চিরন্তন
আজ কেন দেখি চারিদিকে শুধু ভাঙনের ইন্ধন
গুড়িয়ে যাচ্ছে ইতিহাস আর মানচিত্রের রূপ
তবুও কেমন বসে আছি মোরা নিস্তাপ নিশ্চুপ
সেতু ভেঙে পরে সমাজের যতো ধূর্তের ষড়যন্ত্রে
এ ভাঙন রুখতে পারো শুধু ভালবাসার মন্ত্রে
জাত - ধর্মের ঠুলি খুলে যদি তাকাও সাদা চোখে
সম্পর্কের নতুন সেতু গড়ে উঠবে চতুর্দিকে

ক্ষুদ্‌দার মনে হল লাস্ট ডে'জ অফ পম্পেই'র রেপ্লিকা

অনুপম গুপ্ত

বছর তিনেক আগে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে ক্ষুদ্‌দা এবং রমলা বৌদি জাপানে গিয়েছিলেন। খুব মজা, খুব আনন্দ। সব থেকে বেশি মজা পুটকুর – এই তিনমাসে লাগামছাড়া দুষ্টুমির জন্য কেউ ওকে বকবেনা। অবশ্য পুটকুর জ্যাঠতুতো দিদি ফুচারও এই অভিজ্ঞতা, তবে তারা এখন জাপানের নয়, ভারতের বাসিন্দা। দু'হাজার তেইশ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাপানে থাকাকালীন ক্ষুদ্‌দার দুটি ঘটনার কথা না বললেই নয়।

জাপানে থাকার সময়ে ক্ষুদ্‌দারা সবাই মিলে দুদিনের জন্য তোচিগি জেলার নাসু বলে একটা জায়গায় বেড়াতে গেলেন। শোনা যায়, জায়গাটি জাপানের সম্রাট পরিবারের খুব পছন্দের। এটি প্রকৃতি এবং পরিবার বান্ধব জায়গা হিসেবেও পরিচিত। ক্ষুদ্‌দারা দুদিন থাকলেন পুরো জঙ্গলের মধ্যে একটা দোতালা কাঠের বাড়িতে। কাঠের বাড়ি হলেও, যেমন তেমন অতি সাধারণ নয়, রীতিমত ঝাঁ চকচকে। ইঁট, লোহা, স্টোন চিপ্‌স, সিমেন্টের বালাই নেই, civil engineering এর advanced technology। বাড়ির ভিতরে সৌখীনতার একদম ত্রুটি নেই, সবই ডিজিটাল। বাড়িতে ঢোকা, জলগরম করা, বীয়ারের বোতল ঠাণ্ডা করা, কমপ্লেন লজ করা, চেক আউট করে বেড়োনো সবই নির্ভর করছে কতকগুলো সংখ্যার উপর। অঙ্কে কাঁচা হলে কি সারা জীবন জাপানের জঙ্গলে ঐ কাঠের বাড়িতে আটকে থাকতে হবে? ঐ জন্য কিনা জানিনা, বাড়িতে ঢোকা এবং বেরোনোর সময় বৌদির হাতে বিপদ তাড়িনী দেবীর একটা ফটো থাকত।

লগ হাউসটি জঙ্গলের মধ্যে বানানো বলে বাড়ির তিন দিক গাছ, ঝোপঝাড় দিয়ে ঘেরা। প্রবেশ পথ লোহার চেন দিয়ে আটকানো বলে সোজাসুজি যাওয়া যায়না। চেনটাকে ডিঙিয়ে যেতে হয়। ভাল্লুকদের আটকানোর জন্য এই সিকিউরিটির ব্যবস্থা। ভাল্লুকরা হয়তো ভাবছে শ্রীমতি রমলা চাকলাদার কি করে লোহার চেন ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকছে, তিনিও তো সোজা হয়ে হাঁটতে পারেন না।

তবে তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে জঙ্গলের স্থায়ী বাসিন্দারা লোহার চেন ডিঙিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করার টেকনিক রমলা বৌদির কাছ থেকে জেনে নেয়, তাহলেও জোর গলায় বলা যায় ওরা কিচ্ছুই করবে না, কারণ সম্রাট তো বলেই দিয়েছেন, এই জায়গাটাতে সবাই সবার বন্ধু, কেউ কারোর ক্ষতি করবেনা। আহারে আমাদের সুন্দরবনের বাঘেদের এই খবরটা এখনও পর্যন্ত কেউ দিল না কেন?

যাই হোক বাড়িতে ঢুকে দেখা গেল সবই আছে এবং অত্যন্ত সুশৃংখলভাবেই আছে। পাঁচ তারা না হলেও তিন/চার তারা হোটেলের মত হবে হয়তো। কিন্তু তফাৎ হচ্ছে কোন ওয়েটার নেই। রাত্‌তিরে নাকি ওখানকার স্থায়ী বাসিন্দারা মানে ভালুক বা কাঠবিড়ালীরা এসেছিল দাদা বৌদিদের নতুন জায়গায় কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা জানতে। মাঝরাতে দাদাদের কাছ থেকে কোন রেসপন্স না পেয়ে ওরা বুঝতে পেরেছিল যে কোনরকম কমপ্লেন নেই। আর সময় নষ্ট না করে ওরা চলে গিয়েছিল অন্য বিদেশি ট্যুরিস্টদের খোঁজ নিতে। ওদের আগমন বার্তা বৌদি নাকি পেয়েছিলেন এবং কাউকে কিছু না বলে বিছানায়

বসে রক্ষাকালীর প্রাণ বাঁচানোর মন্ত্র পাঠ করে গিয়েছিলেন ওরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত।

বৌদির নাকি অনেক দিনের সখ যেটা কাউকেই বলতে পারেননি, কিন্তু মনের মধ্যে সখটা চেপে রেখেছেন। রাধাকৃষ্ণ যেভাবে ঝুলন উৎসবে একসঙ্গে দোল খেতেন, বৌদিরও সেরকম একটা ইচ্ছে ছিল। যদি কোন দোদুল্যমান কিছুতে ওঠার চান্স পেতেন তাহলে হয়তো মন খুলে গাইতেন (একটা সিনেমার গান)

"দোলে কৃষ্ণ দোলে ঝুলনা
দোলে রাই দোলে ঝুলনা
দোলে দোদুল দোলে নাই তুলনা"।

কিংবা প্রেম রস বেশি হলে রবীন্দ্রসঙ্গীতও বাদ দিতেন না –

"দোদুল দোলায় যাও দুলিয়ে"।

বৌদির মনের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হল, তবে মাত্র দশ শতাংশ। বাকি নব্বুই শতাংশ বিশ্বাসঘাতকতার দোষে দুষ্ট। বৌদি একদম হতাশ। বহু লোক এসেছে তিনশ মিটার লম্বা একটা ঝুলন্ত (suspension) ব্রীজ দেখতে বা ব্রীজের ওপর দিয়ে হেঁটে ব্রীজের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে। অসংখ্য লোহার দড়ি দিয়ে বানানো একটা বিশাল ব্রীজ যার নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে খরস্রোতা স্রোতস্বিনী। ওই ব্রীজ দিয়ে যাওয়ার নিরাপত্তা নিয়ে জাপান সরকার একশ নয়, এক্কেবারে দু'শো শতাংশ নিশ্চিত। কিন্তু ব্রীজ যে ভীষণ দুলছে তার কি হবে? ব্রীজ দিয়ে দাদার হাত ধরে কিছুটা যাওয়ার পর বোঝা গেল এটা রাধাকৃষ্ণের ঝুলন উৎসব নয়। যে কারণেই হোক স্বামী স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। বৌদির অবস্থা দেখে একটা ইয়ং জাপানি মেয়ে হাসতে হাসতে কি যেন বলল, এবং বৌদিকে শক্ত করে ধরে ব্রীজ শুরু হওয়ার জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে গেল। মেয়েটা কি বলছিল বৌদি জানেন না, তবে মনে হয় যে তাদের দেশীয় ভাষায় হাসতে হাসতে বলছিল, আরে দিদি! এত লম্বা কাপড় দিয়ে তোমরা তোমাদের শরীর ঢাকো, আর সেই সঙ্গে তোমাদের সাহসও ঢাকা পড়ে যায়।

ক্ষুদ্‌দা দোদুল্যমান ব্রীজের ওপর দিয়ে পুরোটা পথ গেলেন এবং কি করে যে ফিরেও এলেন সে আর মনে আনতে চান না। পুটকুকে হাসি মুখে লাফিয়ে লাফিয়ে ফিরে আসতে দেখে বৌদি বুঝতে পারলেন না পুটকু আনন্দে লাফাচ্ছে, নাকি ঝুলন্ত ব্রীজ ওকে লাফাতে বাধ্য করেছে। বৌদির আর দাদাকে নিয়ে গানটা গাওয়া হলনা -

"যেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে
ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা"।

আহারের ব্রেক ও বিশ্রামের পর আবার পথ চলা এবং গন্তব্যস্থল মাউন্ট নাসু, যার উচ্চতা ৬০০০ ফিটের উপরে, রোপওয়ের সাহায্যে ওপরে উঠতে হয়, এবং যেখানে নামিয়ে দেয় সেই রোপওয়ের প্রান্তিক স্টেশনটাই নাকি পাহাড়ে ওঠার বেস ক্যাম্প। তারপর ট্রেকিং করে পাহাড়ের চুড়ায় উঠতে হয়। রমলা বৌদি এবং তার পুত্রবধু অহেতুক এবং অপ্রয়োজনীয় সাহসিকতা প্রদর্শনে অনিচ্ছুক বলে রোপওয়ের ওই প্রান্তিক স্টেশনে দুকাপ কফি নিয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

অসম বয়সী এবং অসীম সাহসী তিন প্রজন্মের পুরুষেরা হাল্কা মেঘের ভিতর দিয়ে পাহাড়ি পথের পাথর ডিঙিয়ে চড়াইয়ে উঠতে লাগল। সাপোর্ট বলতে পাহাড়ি পথের এক পাশে লোহার রেলিং। পাহাড়ের উচ্চতা জনিত অক্সিজেনের অভাব বুঝতে পারলো পাঁচ এবং আশি বছরের দুই আরোহী এবং সেইজন্য চড়াইয়ের প্ল্যান বাতিল করে উৎরাই-এর পথ ধরল। পুটকুর মন খারাপ কারণ ওপরে গেলে হয়তো পোলার বীয়ারদের দেখা পাওয়া যেত।

দিনের শেষের গন্তব্যস্থল মাউন্ট আসামা, যেটা নাকি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি। কি ভয়ানক, একেই আগ্নেয়গিরি, তার ওপর জাগ্রত! কি দরকার! পয়সা খরচ করে এইসব জায়গায় আসার কোন মানে হয়?

অনেকটা দূর থেকেই আসামা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যাচ্ছিল। ক্ষুদ্‌দার কিন্তু সবসময় মনে হচ্ছিল 79 ADতে ইটালির ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি থেকে যে লাভা উদ্‌গিরণ হয়েছিল তার কথা। ঔপন্যাসিক Edward Bulwer Lytton রচিত LAST DAYS OF POMPEI উপন্যাসে জ্বলন্ত লাভার যে ধ্বংসলীলা বর্ণিত হয়েছিল, অথবা রাশিয়ান চিত্রশিল্পী Karl Briullov তার রঙ তুলিতে পম্পেই শহরের বিপর্যয় যে ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, এক্ষুনি যদি আসামা আগ্নেয়গিরির ফুটন্ত লাভা তাদের ঢেকে দেয়, তাহলে কি পম্পেই শহরের মত ধ্বংসের সেকেণ্ড এডিশান বেরোবে? নাম হতে পারে "জাপানে পম্পেই ধ্বংসের রেপ্লিকা"।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, শুধু ধোঁয়াই বেরোচ্ছিল, কারোর কিছুই হলনা, কারোর ফোস্কাও পড়েনি।

ফেরার সময় ক্ষুদ্‌দার মনে হচ্ছিল, কিছু হলনা ঠিক কথা, কিন্তু যদি পম্পেই শহরের সেই দুর্ঘটনার রেপ্লিকা হত, তাহলে তাদের আগামী বিবাহ বার্ষিকীতে সুখী দাম্পত্যের চিহ্নস্বরূপ নবরত্নের হার কেনার জন্য টাকার চিন্তা করতে হতনা। ইনকাম ট্যাক্সের কোনো ঝামেলাও থাকতনা, কলকাতার পৌর প্রতিষ্ঠানের আগামী নির্বাচনে দাদা যদি পাড়ার মনোনীত নির্দল প্রার্থী হতেন, তাহলেও দাদার জামানত বাজেয়াপ্ত হত কিনা জানা গেলনা। দেখা যাবেনা পুজোর প্যাণ্ডেলে মালায় সজ্জিত দাদার বাঁধানো ছবির নীচে লেখা –

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম

দেখা হলনা, ফ্লাড লাইটে ক্ষুদিরাম চাকলাদারের স্মৃতিতে এক ঘন্টার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এত কিছু হতে পারত, কিন্তু কোন কিছুই হলনা।

ওদিকে রমলা বৌদি হয়ত ভাবছিলেন সদ্য বানানো একজোড়া কানের দুলের কি হবে? কাউকে দিয়ে আসলে সে অন্তত বৌদির সুখ্যাতি করত। আরও ভাবছিলেন বকুল বাগান রোডের বাড়ির প্রতিবেশীরা আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত লাভায় ভস্ম হওয়ার খবর কাগজে বা টিভিতে দেখার পর আহা উহু করত, নাকি বলত – ঠিক হয়েছে, যা ঝগড়াটে মহিলা। পাশের বাড়ির চন্দ্রিমা লাখোটিয়া হয়ত কেঁদে কেঁদে বলত, জাপানে যাওয়ার আগে রমলা আন্টিকে এতগুলো জ্যাঙ্গ জুয়েলারীর গয়না দিলাম, সব ভস্ম হয়ে গেল!

তবে কোন দুর্ঘটনাই শেষ পর্যন্ত ঘটেনি। আসামা আগ্নেয়গিরি যেমন ছিল তেমনই আছে। লাস্ট ডে'জ অফ পম্পেই-এর কোন রেপ্লিকা হলনা। আগামী বিবাহ বার্ষিকীতে নবরত্নের হার কিনতে না পারার আর কোন অজুহাত থাকল না। চন্দ্রিমা লাখোটিয়াও নিশ্চিত গয়নাগুলো আন্টির থেকে ফেরৎ পাবে। এই আগ্নেয়গিরি সবার মঙ্গলই করলো।।

শুধু আজকের দিন

স্বামী মেধসানন্দ

প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত কবি কালিদাসের 'আজকের দিনটিতে নজর দাও'- শীর্ষক একটি বিখ্যাত কবিতা আছে। অবশ্য এই কবিতাটি প্রকৃতপক্ষে কালিদাসের রচিত কি না তা নিয়ে সংশয় আছে। কারণ কালিদাসের কোন লেখায় এই কবিতাটির সমার্থক কোন রচনা এখনও পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। যাহোক ঐ কবিতার বক্তব্যটি অনুশীলন করলে তার ফল আমাদের জীবনে সুদূরপ্রসারী হবে।

'আজকের দিনটিতে নজর দাও'

আজকের দিনটির ওপর নজর দাও
কারণ এটাই হল জীবন।
এর সংক্ষিপ্ত বিস্তারে রয়েছে
অস্তিত্বের যাবতীয় বাস্তবতা আর সত্য,
বেড়ে ওঠার আনন্দ,
আর কর্মকুশলতার গৌরব।
কারণ গতকাল কেবলই এক স্মৃতি,
আর আগামীকাল কেবলই এক স্বপ্ন।
সুন্দরভাবে যাপিত আজকের এই দিনটি
প্রতিটি গতকালকে সুখের স্মৃতি করে তোলে,
আর প্রতিটি আগামীকালকে করে তোলে এক সফল স্বপ্ন।
তাই আজকের এই দিনটির ওপর গুরুত্ব দাও।

লিও টলস্টয়ের 'তিনটি প্রশ্ন' নামে একটি সুন্দর গল্প আছে। গল্পের প্রশ্নগুলির উত্তর থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হল : - আমাদের পক্ষে সবথেকে মুল্যবান সময় হল – এখনই, এই মুহূর্তটি; আমাদের পক্ষে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হল এই মুহূর্তটিতে আমরা যার সঙ্গে আছি সে; আবার আমাদের পক্ষে সবথেকে বড় অভীষ্ট হল ঐ মানুষটিকে খুশি রাখা।

বর্তমান মুহূর্তটির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার এই অভ্যাসের অনুশীলন প্রসঙ্গে আরও দু'টি সম্পর্কিত অভ্যাস গুরুত্বপূর্ণ ও সহায়ক। প্রথমটি হল – 'এক বারে একটি কাজে মনোনিবেশ করা'। এর অর্থ হল, যখন আমরা একটি কাজে হাত দিই, সেটাকে অর্ধসমাপ্ত রেখে অন্য কাজ করা উচিত নয়। দ্বিতীয়টি হল – 'তাড়াহুড়ো কোরো না, একটু ধীরে চল'। তাড়াহুড়ো করার প্রবণতা অনেকসময়ই আমাদের ভিতরের অস্থিরতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এর প্রতিকার করতে হলে এই প্রবণতা আমাদের কাজের নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করতে হবে।

বর্তমান মুহূর্তটিতে দৃষ্টিনিবদ্ধ করার সুফল

বর্তমান মুহূর্তটির ওপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করার বেশ কিছু ইতিবাচক ফল রয়েছে। প্রথমত, এভাবে শুধুমাত্র বর্তমানে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে আমরা অতীতে বা ভবিষ্যতে অথবা কল্পনার জগতে বিচরণ করার প্রবণতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে আমাদের মূল্যবান সময় ও জীবনীশক্তির অপচয় বন্ধ করতে পারি, এবং এভাবে বাঁচানো সময় ও জীবনীশক্তি আমরা আরও ভালো উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে পারি।

দ্বিতীয়ত, এর ফলে আমাদের হাতের কাজটি আরও নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা যায়।

তৃতীয়ত, বর্তমান সময়টিকে ভালোভাবে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারি।

চতুর্থত, আমাদের মনে অবাঞ্ছিত নানা চিন্তার হঠাৎ হঠাৎ উদয় হওয়াটা আটকানো প্রায় অসম্ভব। তবে তাকে আর বাড়তে না দেওয়ার উপায় হল বর্তমান মুহূর্তটিতে দৃষ্টিনিবদ্ধ করা।

সব শেষে বলা যায়, একটা সময়-সূচি তৈরি করে তাকে মেনে চলার সময় বর্তমান মুহূর্তের ওপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করার আর একটি সুফল হল, মনকে এই সূচি মেনে চলার নির্দেশ দিয়ে, এবং সে এটা মেনে চলছে কিনা তা লক্ষ্য রেখে, আমরা প্রকৃতপক্ষে আমাদের মনকে ঠিকপথে চালনা, এবং তার উপর নজরদারি করতে পারি। এভাবেই আমরা আমাদের বানরের মত সদা চঞ্চল মনকে (monkey-mind) নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।

ভগবান বুদ্ধও একবার মন্তব্য করেছিলেনঃ আমাদের দেহ ও মনের সুস্বাস্থ্যের গোপন কথাটি হল - অতীত নিয়ে অনুশোচনা করা নয়, অথবা ভবিষ্যতের কল্পিত বিপদ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়াও নয়; বরং বর্তমানকে গুরুত্ব দিয়ে বিচক্ষণতার সঙ্গে বাঁচা।

মাঝে মাঝে অবশ্য আমাদের মনোযোগ পুরোপুরি দখল করে রাখার পক্ষে আমাদের হাতে পর্যাপ্ত কিছু কাজ বা বিষয় থাকে না। এই সব সময়েই আমাদের মন ইচ্ছামত এদিক-ওদিক ছুটে বেড়ায়। এটা আমাদের মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার পক্ষে ক্ষতিকারক। এই সব সময়ে – যেমন, প্রাতঃভ্রমণের সময়, কিংবা ট্রেনে – বাসে যাতায়াতের সময়, অথবা গাড়ি চালানোর সময় - আমাদের মনকে লক্ষ্যহীন ভাবে ছুটে বেড়ানো থেকে নিরস্ত করতে আমরা মনে মনে ঈশ্বরের নাম জপ করতে পারি, স্তোত্র পাঠ, বই পড়া কিংবা মনকে শান্ত করার উপযোগী পছন্দসই কিছু গান শুনতে পারি।

'শুধুই আজকের জন্য'

ডেল কার্নেগীর বহুপঠিত 'How to Stop Worrying and Start Living' গ্রন্থটিতে তিনি সিবিল এফ পারট্রিজ (Sybil F Partridge) (ইনি একজন ক্যাথলিক সিস্টার, যিনি সিস্টার মেরি জেভিয়ার নামেও পরিচিতা) এঁর ১৮৫৬ সালে লেখা 'Just for To-day'-শীর্ষক একটি কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। সেই সময় থেকেই তাঁর এই কবিতা অন্য মতাবলম্বী খ্রিস্টানদের প্রার্থনা মন্ত্রেও সংযুক্ত হয়েছে। কোন কোন লেখক এই কবিতাটিকে তাঁদের লেখায় ব্যবহার করেছেন কিছুটা অদল-বদল করে।

Just for To-day কবিতার মূল ভাবনা বর্তমান লেখায় অন্তর্ভুক্ত করার সময় আমরাও এর মধ্যে কিছু কিছু নূতন ভাবনা যোগ করেছি।

'শুধুই আজকের জন্য'

(১) শুধুমাত্র আজকের জন্য, আমি খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় পর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট সময়-সূচি মেনে চলব। এই সময়-সূচিতে আমার শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য আলাদা আলাদা সময় বরাদ্দ থাকবে।

(২) শুধুমাত্র আজকের জন্য, আমি সকালে ও সন্ধ্যায় দিনে দুবার অন্ততঃ পনেরো মিনিট ধরে ধ্যান এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব। আমি ঈশ্বরের সঙ্গে এইভাবে সারাদিন নিজেকে সংযুক্ত রাখব। যখন আমি কোন কাজে ব্যাস্ত থাকব, বা যাতায়াতের পথে থাকব, কি স্নান করব- সেইসব সময় আমি অন্তত কয়েকবার ঈশ্বরের নাম জপ করব। আমি সারাদিন যখনই যা কিছু খাই বা পান করি, মনে মনে সে সবই ঈশ্বরকে নিবেদন করব।

(৩) শুধুমাত্র আজকের জন্য, আমি মনে মনে আমার নিজের, অন্য মানুষজনের এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্বরূপ নিয়ে চিন্তাভাবনা করব।

(৪) শুধুমাত্র আজকের জন্য, আমি আমার জীবনের অর্থ ও প্রকৃত লক্ষ্য নিয়ে, এবং জীবনের এই লক্ষ্য পূরণ করার জন্য আমি কী কী করি, ও করতে পারি তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করব।

(৫) শুধুমাত্র আজকের জন্য, আমি আধ্যাত্মিক এবং চিন্তা-উদ্দীপক গ্রন্থাদি পাঠ করব, এবং নতুন কিছু শিখব, কেননা প্রতিদিন নতুন কিছু

শিখলে জীবন অর্থবহ হয়ে ওঠে।

(৬) শুধুমাত্র আজকের জন্য, আমি কিছুক্ষন দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাস নেব, স্ট্রেচিং করব এবং হাঁটব।

(৭) শুধুমাত্র আজকের জন্য, যাই ঘটুক না কেন আমি বিচলিত হব না, উদ্বিগ্ন হব না, বা অসন্তুষ্ট হব না। আমি অভিযোগ করব না, অসন্তোষ প্রকাশ করব না। বরং শান্তভাবে প্রতিটি সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব।

(৮) শুধুমাত্র আজকের জন্য, আমি কারও সমালোচনা করব না, অথবা কাউকে বদলানোর চেষ্টা করব না। বরং আমি অন্যদের প্রশংসা করব, অন্যদের উৎসাহিত করব, আর তাদের মধ্যে ইতিবাচক গুণ দেখব।

(৯) শুধুমাত্র আজকের জন্য, আমি কেবল চলমান দিনটির ওপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। হাতের কাজগুলি ভালভাবে এবং নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করব, এবং প্রতিটি মুহূর্তকে উপযুক্ত ভাবে কাজে লাগাব, যেন আমার কোন 'গতকাল' ছিল না, এবং কোন 'আগামীকাল'ও নেই।

(১০) শুধুমাত্র আজকের জন্য, আমি কাজ করব নিজেকে ঈশ্বরের যন্ত্র ভেবে, আমার কাজের দ্বারা অন্যদের সেবা করার মধ্য দিয়ে আমি ঈশ্বরেরই সেবা করছি, এই ভাবনা নিয়ে, এবং দিনের শেষে সকল কর্মের ফল ঈশ্বরকেই নিবেদন করব।

(১১) শুধুমাত্র আজকের জন্য, আমাকে প্রশ্ন না করলে আমি নিজে থেকে কোন কথা বলব না। টিভি দেখব না, কম্পিউটারে কাজ করব না, মোবাইল ব্যবহার করব না।

(১২) শুধুমাত্র আজকের জন্য, আমি অনুভব করার চেষ্টা করব, আমি অন্যদের কাছে এবং প্রকৃতি মায়ের কাছে কতখানি ঋণী, এবং আমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অন্যদের ও প্রকৃতি মায়ের অবদান কতখানি। অন্যদের সাহায্য করার পাশাপাশি আমি তাদের এবং প্রকৃতি মায়ের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

'শুধুমাত্র আজকের জন্য'-এই দ্বাদশ-পদীটিতে আমাদের সর্বতোমুখী বিকাশ ও রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় সদভ্যাসের কথা বলা হয়েছে। 'শুধুমাত্র আজকের জন্য'-এই বাক্যাংশটি বারবার বলা হলেও এর অর্থ এই নয় যে, এসব আমরা সারাজীবন মাত্র একবারই অভ্যাস করব। বরং এর অর্থ হল এই যে, এসব সদভ্যাস আমরা অন্তত শুরু করব প্রথমে একদিনের জন্য, এবং তারপর চেষ্টা করব এটা যথাসম্ভব প্রতিদিন চালিয়ে যেতে। কিছু কিছু অভ্যাস, যেমন, 'আমাকে অনুরোধ করা না হলে আমি কোন কিছু বলব না', বা 'মোবাইলে কথা বলা থেকে বিরত থাকা' বা 'টিভি না দেখা' – এসব অভ্যাস কিছু মানুষের পক্ষে হয়তো সম্ভব নয়। তবু এসব ব্যাপারে আমরা নিজেদের অন্ততঃ কিছুটা সংযত বা নিয়ন্ত্রিত করতে পারি-যেমন এসব থেকে আমরা সপ্তাহে একদিন, বা পনেরো দিনে একদিন, সকাল থেকে দুপুর / সন্ধ্যে থেকে শুয়ে পড়া পর্যন্ত বিরত থাকতে পারি। যদি তা করতে পারি তারও সুফল আছে।

আসুন, এইভাবে আমরা একটা মূল্যবোধ-নির্ভর জীবনযাপনের প্রয়াস চালিয়ে যাই। তার কল্যাণকর প্রভাব শুধু আমাদের উপর নয়, আমাদের আশেপাশের সকলের উপর পড়বে।

।। অয়ম্ আরম্ভঃ শুভায় ভবতু।।

মহানায়ক

তপন কুমার রায়

দেখতে দেখতে চুয়াল্লিশটা বছর কেটে গেল মানুষটা চলে গেছেন। কিন্তু বাংলায় এমন কোন পত্রিকা বা ম্যাগাজিন আজও আছে বলে মনে হয় না যাতে ৩রা সেপ্টেম্বর আর চব্বিশে জুলাই উত্তমকুমার সম্বন্ধে কিছু লেখা না হয়। সফল নায়ক থেকে কিভাবে উনি বাংলা তথা ভারতীয় সিনেমার দর্শকদের কাছে মহানায়ক হয়ে উঠলেন ভাবলে অবাক হতে হয়।

আহিরিটোলায় মামার বাড়িতে অরুণ জন্মায় ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯২৬ সালে। ওর পিত্রালয় ছিল দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে। স্কুলের শিক্ষা স্থানীয় বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ে আর পাঁচটা বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারের মত। অরুণ ছোটবেলা থেকেই পাড়ার নাটক যাত্রা অনুষ্ঠানে নিয়মিত ছিল দর্শক আসনে। তখন থেকেই স্টেজের ওপর অভিনেতাদের হাঁটাচলা, বাচনভঙ্গি খুঁটিয়ে দেখত। বাড়ির ছাতে একা একা অনেকের অভিনয় নকল করার চেষ্টা করত। দর্শক হিসেবে থাকত ছোট ভাই তরুণ। দেখতে দেখতে স্কুল পেরিয়ে কলেজের গণ্ডি পেরোলে বাবার টানাটানির সংসারের খানিকটা দায়িত্ব বর্তায় জ্যেষ্ঠ সন্তান অরুণের কাঁধে। পোর্ট কমিশনারে মাসিক পনেরো টাকার মাইনেতে লেজার কীপারের দশটা পাঁচটার চাকরী সেরে অরুণ বিকেল সন্ধ্যে কাটাত পাড়ার বড়দের সঙ্গে যাত্রা নাটকের রিহার্সাল ঘরে। ততদিনে অরুণ নিজেও একটা রোগা পাতলা লম্বা পরিণত যুবক। ওর মোটা ঠোঁট আর চওড়া নাকের জন্য সবার থেকে টিটকিরি শুনতে হত। অরুণ ওসবে কান না দিয়ে সাঁতার, ব্যায়াম আর ফুটবল খেলে শরীরটাকে তৈরী করার দিকে মনোযোগ দিল।

এই সময় পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে মাঝে মাঝে চৌরঙ্গী পাড়ায় ইংরেজি সিনেমা দেখে সেলুলয়েড জগতের ওপর একটা টান অনুভব করে যুবক অরুণ। ও বুঝতে পারল যে সিনেমার অভিনয় মঞ্চের অভিনয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে গলা নামিয়ে কথা বলা যায়। ক্যামেরার অবস্থান বুঝে শরীরী ভাষা প্রকাশ করা যায়। ক্লোজ আপ শটের জন্য চোখকে অভিনয়ের অঙ্গ হিসেবে আলাদা করে ব্যবহার করা যায় যেটা থিয়েটারের মঞ্চে একেবারেই সম্ভব নয়। যুবক অরুণের কাছে অভিনয় জগত একেবারে নতুন ভাবে উপস্থিত হল। বাংলা সিনেমায় ওর পূর্বসূরিদের মধ্যে প্রায় সবাই সিনেমার পর্দায় যাত্রা-থিয়েটারের এই অতি অভিনয় দোষে দুষ্ট ছিলেন। কাজের পর বাড়ি ফিরে অরুণ বিভিন্ন সংলাপ আলাদা আলাদা করে বলা অভ্যেস করা শুরু করল। দুটি সংলাপের মাঝে pause দেওয়া কতটা জরুরী সেটা মারলন ব্রান্ডো এবং অন্যান্য অভিনেতার থেকে শিখল। এটাও লক্ষ্য করল যে যখন সহঅভিনেতাদের সংলাপ চলে তখন নির্বাক চরিত্রের মুখভঙ্গি ও শরীরের ভাষা কিরকম হওয়া উচিত। ওর অভিনয়ের অভ্যাসের জায়গা ছিল বাড়ীর ছাতে। দর্শক হিসেবে থাকত ছোটভাই তরুণ আর পাড়ার দুএকজন যারা ওর অধ্যাবসায় দেখে অবাক হত। অরুণের চাকরি আর অভিনয়ের নেশা নিয়ে সারাদিন কেটে যেত।

দেশ তখন স্বাধীনতা লাভের উৎসবে মত্ত। সাতচল্লিশ সালে টালিগঞ্জ পাড়ায় একটা হিন্দি ছবিতে অভিনয় করে অরুণ আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে সবাইকে বলে বেড়াতে লাগল। কিন্তু বিধি বাম। ডিস্ট্রিবিউটারের অভাবে সে ছবি দিনের আলো দেখতে পেল না। আটচল্লিশ সালে দৃষ্টিদান ছবি দু সপ্তাহ চলে উঠে গেল। সারাদিন পোর্টের চাকরির পর অরুণ স্টুডিও পাড়ার দরজায় কড়া নাড়ত, কিছু কাজের আশায়। এরপরে পরপর কামনা, মর্যাদা, ওরে যাত্রী নামে পরপর তিনটে ছবি ফ্লপ করলে লোকে ওকে টিটকিরি দিত ফ্লপ মাস্টার জেনারেল বলে।

Nervous আর Unassuming একটা উঠতি অভিনেতার দিকে কেউ ফিরেও চাইত না। দর্শকদের তাচ্ছিল্য আর অপমান কিন্তু অরুণকে দমাতে পারেনি।

দেখতে দেখতে ১৯৫২ সাল এলে পরিচালক নির্মল দে এই ফ্লপ মাস্টারের অরুণ কুমার নাম পাল্টে উত্তমকুমার রেখে বসু পরিবার তৈরি করেন যাতে সাবিত্রী চ্যাটার্জী ওর বিপরীতে নায়িকার ভুমিকায় অভিনয় করেন। সিনেমা রিলিজের পর দর্শক মহলে হুলুস্থুল পড়ে যায় সিনেমাটির বক্স অফিসে অভূতপূর্ব সাফল্যের পর। অরুণকুমার পোর্টের চাকরিতে ইস্তফা দেয় আর বাংলা সিনেমা জগতে এক নতুন "স্টারের" জন্ম হয় যার নাম উত্তমকুমার। ১৯৫৪ সালে সত্যজিতের হাত ধরে পথের পাঁচালি যখন বিশ্বের দর্শকদের কাছে বাংলা সিনেমা পৌঁছে দিচ্ছে সেই সময় টালিগঞ্জের স্টুডিও এক লাজুক, রোগা, ঢ্যাঙ্গা অভিনেতার হাত ধরে সাড়ে চুয়াত্তর, অগ্নিপরীক্ষা ইত্যাদি ছবির মাধ্যমে বাংলা সিনেমা একজন নতুন তারকার জন্ম দিল। রূপালি পর্দায় রোমান্টিসিজম্ এক নতুন সত্ত্বা নিয়ে আবির্ভূত হল প্রমথেশ বড়ুয়া, দুর্গাদাস ব্যানার্জী ও ছবি বিশ্বাসের পর। বাংলা সিনেমার এই নতুন নায়ক দেখিয়ে দিল যে থিয়েটারের মঞ্চে যে অভিনয় করা হয় রূপালি পর্দায় তা চলে না।

রাস্তাঘাটে অচেনা লোকজন তখন বলতে শুরু করে দিয়েছে, ওই দ্যাখ উত্তমকুমার। সেই শুনে ওর অন্যরকম অনুভূতি হত। ততদিনে বাসট্রাম ছেড়ে গাড়িতে যাতায়াত শুরু করে দিয়েছে বাংলা ছবির নতুন নক্ষত্র উত্তমকুমার।

এরপর উত্তমকুমার প্রায় বত্রিশ বছর এক নাগাড়ে সিনেমা করেন। হিসেব করলে বছরে ছটা করে রিলিজ। সব মিলিয়ে উনি ১৯৭টা ছবি করেন মরণোত্তর ৬টা রিলিজ বাদ দিয়ে। একষট্টি সালের পর প্রতিষ্ঠিত রোমান্টিক নায়কের ভুমিকা ছাড়াও উনি চরিত্রাভিনেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনে চাকর চরণের ভুমিকা থেকে অত্যাচারী জমিদার বা সন্ন্যাসী রাজাতে ঘর ছাড়া জমিদার বা এ্যাংলো ইন্ডিয়ান কবিয়াল এ্যান্টনী ফিরিঙ্গী, বা বনফুলের অগ্নীশ্বর ছবিতে ডাক্তারের ভুমিকায় বা তারাশঙ্করের অমর সৃষ্টি সপ্তপদী সিনেমায় কৃষ্ণেন্দু থেকে রেভারেন্ড কৃষ্ণস্বামী এখনও দর্শকদের মুগ্ধ করে রাখে। এই সিনেমায় মোটরবাইক চালিয়ে রিনা ব্রাউন রুপী সুচিত্রা সেনের সঙ্গে একটা গানের দৃশ্য (এই পথ যদি না শেষ হয়) শুট করার আগে ওনার যোগব্যায়ামের শিক্ষক কমল ভাণ্ডারীর থেকে কাক ভোরে ময়দানে গিয়ে বাইক চালানো শেখেন। কিন্তু পরিচালক অজয় কর কোন পথ দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য সবটাই ইনডোর শুটিং করেন নায়কের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও। বলেছিলেন কোন দুর্ঘটনা ঘটলে উত্তম-সুচিত্রার ফ্যানরা আমাকে দেশ ছাড়া করে দেবে। বিভূতিভূষণের লেখা নিশিপদ্ম গল্প অবলম্বনে অরবিন্দ মূখার্জীর পরিচালনায় এই সিনেমা দেখে বম্বের শক্তি সামন্ত অমর প্রেম নামে একটা হিন্দি সিনেমা করেন রাজেশ খান্না আর শর্মিলা ঠাকুরকে নিয়ে। রাজেশ খান্না বলেছিলেন নিশিপদ্ম মোট বাইশ বার দেখেছিলাম উত্তমকুমারের মত অভিনয় করার জন্য। কিন্তু অমর প্রেম রিলিজের পর দেখলাম আমি ওর ধারেকাছেও আসতে পারিনি।

ওর নিকটজনের লেখা পড়ে ও বিভিন্ন সাংবাদিকদের তথ্য থেকে আমরা নায়ক থেকে এক অন্য মানুষ উত্তমকুমারের সন্ধান পাই। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ নিয়ে কি করা যায় সেই নিয়ে ভাবতে ভাবতে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করার জন্য। ছাত্রছাত্রীদের শেষ পরীক্ষার রেজাল্ট সহ অনেক আবেদন পত্র এলে ঝাড়াই বাছাই করে তাদের মধ্যে কিছু আবেদনকারীকে লিখলেন বাবা অথবা মাকে সঙ্গে নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে আসতে। একদিন সকালে একটি বাচ্চা ছেলে বাবামাকে ছাড়াই একা এলে প্রশ্নের উত্তরে ছেলেটি বলে যে ওর বাবা ওদের ছেড়ে চলে গেছে। ওর মায়ের পক্ষে রবিবার সকাল ছাড়া আসা সম্ভব নয় কারণ মা যেসব বাড়িতে ঠিকে ঝিয়ের কাজ করে সে সব বাড়িতে ছুটি দেয় না। উত্তমকুমার ছেলেটিকে পাশে বসিয়ে একটা সন্দেশ আর জল দিয়ে বললেন খেয়ে নাও। ওর ছেঁড়া জামাটা দেখে বাড়ির কর্মচারীকে নির্দেশ দেন বাচ্চাটিকে একজোড়া প্যান্ট জামা কিনে দিতে। আর বলেন এই রোববার আমি থাকব না। পরের রোববার অতি অবশ্যই যেন মাকে সঙ্গে নিয়ে আসে। সেই বাচ্চাটি পরবর্তীকালে ভবানীপুর মিত্র ইন্সটিটিউশান স্কুলে মেধার পরিচয় রাখে ও মাট্রিকুলেশানে স্টার মার্ক পেয়ে ইন্টারমিডিয়েট শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হবার সময় সোনার মেডেল পায়। ছেলেটি ওনাকে বাবা বলে ডাকত। সমাবর্তনের দিন বাবাকে আসতে বললে উত্তমকুমার বলেন সেদিন শ্যুটিং থাকায় যেতে পারবেন না। ছেলেটি মুখ শুকনো করে বেরিয়ে যায়। সমাবর্তনের দিন সকালে ছবির পরিচালক কে ফোন করে জানিয়ে দেন যে শারীরিক অসুস্থতার কারণে শুটিং পিছিয়ে দিতে। সমাবর্তন উৎসবে পৌঁছে যান সময় মত। চারিদিকে হইচই বেধে গেলে কর্তৃপক্ষ ওনাকে মঞ্চে ডেকে নিতে বাধ্য হন। সেই ছেলেটির নাম ডাকতে অনুষ্ঠানের পরিচালক মেডেলটি উত্তমকুমারের হাতে ধরিয়ে দেন পুরষ্কার প্রাপকের গলায় ঝুলিয়ে দেবার জন্য। মেডেল পেয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার সময় ছেলেটির চোখে জল দেখে উত্তমকুমার ওকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করেন আরো বড় লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য। "বাবা তুমি যে বলেছিলে আসতে পারবে না।' উত্তরে উত্তমকুমার বলেন 'বোকা ছেলে কোথাকার। আসব বলে না আসতে পারলে তুই তোর বন্ধুদের কাছে ছোট হয়ে যেতিস। জানিস তো আমাকে আমার 'সময়' কয়েকমাস আগে থেকে বিক্রি করে দিতে হয় শুটিঙের জন্য'। ছেলেটি পরবর্তী জীবনে উত্তমকুমারের কথা রেখেছিল।

শুটিঙের মাঝে উনি স্টুডিয়োর কলাকুশলীদের করুণ অবস্থা দেখে বাড়িতে ফিরে ভাই ও সহ অভিনেতা তরুণকে বলেন খুঁজে বের করতে কি ভাবে ওদের দুর্দশা থেকে মুক্তি দেয়া যায় সে নিয়ে ভাবতে। কারণ অভিনেতৃ সংঘ ওদের জন্য প্রায় কিছুই করে না। কিছুদিনের মধ্যেই শিল্পী সংসদ তৈরি হয়ে গেল। আর অভিনেতৃ সঙ্ঘের নব্বই ভাগ শিল্পী ও কলাকুশলী শিল্পী সংসদে নাম লেখাল। সাধন বাগচির তত্ত্বাবধানে সংসদের কাজ উত্তরোত্তর উন্নতি করতে লাগল। উত্তমকুমার এককালীন কুড়ি লক্ষ টাকা দিয়ে ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুলে নানান চ্যারিটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অর্থ সংস্থানের সুরাহা করেন। এই কাজ করতে গিয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন থেকে রাজনীতির কেষ্টবিষ্টুদের অনেক উৎপাত অগ্রাহ্য করেও নিজের লক্ষ্যে এগিয়ে যান। শুটিঙের কাজের চাপ সামলে এসব সামাজিক কাজ করার সময় ও চিন্তা কি করে বের করতেন আজকালকার বহু ম্যানেজমেন্ট গুরু ভাবতেই পারবেন না।

আইআইটি খড়গপুরের ১৯৭০ সালে আর্কিটেকচার নিয়ে পাশ করা অনাদি কুমার দত্ত নামে একটি উত্তম ভক্ত যুবক চাকরি নিয়ে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে যায়। ওখানে গিয়ে কাজের ফাঁকে নিউ ইয়র্ক টেগোর সোসাইটিতে জড়িয়ে পড়লে ওর মাথায় আসে উত্তমকুমারকে আমেরিকা নিয়ে এসে সম্বর্ধনা দেয়ার। সাতাত্তর সাল থেকে ও কলকাতার রামকৃষ্ণ সিনহা নামের এক বন্ধুর মাধ্যমে এক নাগাড়ে লেগে থাকে। অবশেষে ওনাকে রাজী করিয়ে ও সব কাগজপত্র তৈরি করে উত্তমকুমার আর সুপ্রিয়াদেবী কলকাতার বিমানবন্দর থেকে রওয়ানা হন ১৯৭৯ সালের ১৪ই অগাস্ট। নিউ ইয়র্ক, বোস্টন ওয়াশিংটন ডিসি তে অনুষ্ঠান ও অনাদির উদ্যোগে আনা দুটো সিনেমা, স্ত্রী ও লাল পাথর দর্শকরা দেখার সুযোগ পায়। এ ছাড়া স্থানীয় অনাবাসী ভারতীয়দের বিশেষ করে বাঙ্গালীদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে হত উত্তমকুমারকে। প্রশ্নের মধ্যে আর্ট ফিল্ম ও কমার্শিয়াল ফিল্মের বিষয় নিয়ে ওনাকে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এত দক্ষতার সঙ্গে উনি প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেন সেগুলো পড়লে এক অন্য উত্তমকে আবিষ্কার করা যায়। প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হলে অনাদিকে কাছে ডেকে বলতেন, 'বুঝলে অনাদি আমার চিন্তাগুলো আসে বাংলায়। ফলে উত্তর দিতে হয় ইংরাজিতে অনুবাদ করে'। কানাডার টরেন্টো শহরে এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে হারমোনিয়াম বাজিয়ে এ মণিহার আমায় নাহি সাজে গানটা

পরিবেশন করেন দক্ষ সঙ্গীত শিল্পীর মত। ওঁর সারল্য দেখতে পাই যখন শ্রোতারা আরও গান গাইতে অনুরোধ করে। উনি সরল মনে পরিষ্কার উত্তর দেন যে হারমোনিয়াম বাজিয়ে উনি তিনটের বেশি গান গাইতে জানেন না। এই সফরে সবথেকে ভাল অভিজ্ঞতা কি প্রশ্নের উত্তরে বলেন নিউ ইয়র্ক থেকে অনাদি আমাদের একটা বিলাসবহুল ট্রেনে বোস্টনে নিয়ে যাবার সময় এক সাদা চামড়ার সহযাত্রী এগিয়ে এসে বলেন আমাকে উনি চেনেন ইন্ডিয়ান সিনেমার অভিনেতা হিসেবে। বেশি আলোচনার সুযোগ না দিয়ে উনি নেমে গেলেন ওনার গন্তব্য স্টেশন এসে যাওয়াতে। দেখতে দেখতে নানা অনুষ্ঠানে প্রচুর বাঙালী ও অন্যান্য প্রদেশের ভারতীয়দের সই দেয়া থেকে প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পর্ব শেষ হলে নিউ ইয়র্কে ফেরত আসেন লন্ডন হয়ে কলকাতা ফেরার জন্য। শেষ দিনে নিউ ইয়র্কে অনাদির পরিচিত টেগোর সোসাইটির একজনের বাড়িতে ডিনার খাওয়ার পর গৃহস্বামী ওনাকে একটি স্যুট উপহার দিলে চমকে উঠে বলেন, কেন এত খরচ করতে গেলেন? ওদের বললেন পরের বছর সেপ্টেম্বর তিন তারিখে ওনার জন্মদিনে বাড়িতে আসতে। বললেন, রবি ঘোষ আর চিন্ময় রায়কে ডাকব। ওরা দুজন তোমাদের পেটে খিল ধরিয়ে দেবে। ওই রাতে পনের লাইনের একটা কবিতা রচনা করেন যার প্রথম কয়েকটা লাইন ছিল –

আমি নায়ক হয়ে পঁচিশটা বছর পেরিয়ে এলাম
মানুষের এই ভাঙাগড়া – এ খেলাঘরে
সূর্যবিহীন রাত্রির মত কত সুখ কত বেদনা
সবকিছু অনাদরে মুছে ফেলে।
আমাকে শুধু, থাকতে হবে স্মৃতির স্বপ্ন নিয়ে।।

পরদিন অনাদি আর রামকৃষ্ণ কে লেখাটা দেখিয়ে বলেন এতে সুর দিতে পারলাম না। রামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, দিন দিন আমি কলকাতায় ফিরে অনলদাকে দিয়ে সুর করিয়ে নেব।

ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর সকালে চুয়াল্লিশটা দিন আমেরিকাতে কাটিয়ে উত্তমকুমার আর সুপ্রিয়া দেবী দমদম বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

আশি সালের চব্বিশে জুলাই বেল্লিউ নার্সিং হোমে মাঝ রাতে শুটিং চলাকালীন হটাত অসুস্থ বোধ করায় অগণিত ভক্তদের ছেড়ে উনি ইহলোক ত্যাগ করেন ডাক্তারদের সব চেষ্টা বিফল করে। সকাল হলে খবর ছড়াতে সময় লাগল না। গিরিশ মুখার্জী রোডের পৈত্রিক বাড়ি লোকে লোকারণ্য হয়ে গেলে পরিবারের তরফে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করা হয় রবীন্দ্র সদনে মরদেহ রাখার জন্য যাতে জনসাধারন তাদের শেষ শ্রদ্ধা জানাবার সুযোগ পায়। রাইটার্স বিল্ডিং-এর তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর থেকে সে অনুমোদন দিতে অস্বীকার করে এই বলে যে উনি জনসাধারণের অভিনেতা ছিলেন না। বেলা বাড়তে উত্তমকুমারের মরদেহ রাজবেশে সাজিয়ে বাংলা সিনেমা জগতের প্রায় সব কলাকুশলী রওয়ানা হয় স্টুডিও পাড়া হয়ে কেওড়াতলা মহাশ্মশানের উদ্দেশ্যে। মানুষের ঢল নামে রাজপথে তাদের মহানায়ককে শেষ বারের জন্য দেখার। লালবাজারে আটটা থানা থেকে ফোন আসে যে তাদের থানা সবদিক থেকে অবরুদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে সশস্ত্র পুলিস নামাতে হয় মিছিল সামলাতে।

কলকাতা ও শহরতলীতে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে উত্তমকুমারের স্মরণসভা অনুষ্ঠান শেষ হতে মাস খানেকের ওপর সময় লেগেছিল।

সত্যজিৎ রায় উত্তমকুমার চলে যাবার পর ওনার স্মরণসভায় বলেছিলেন, নায়ক সিনেমাটা ওর জীবনী নিয়েই করেছিলাম। পরবর্তী সময়ে সিনেমাটা দেখে আমার পরিচালনায় কিছু খুঁত পেলেও উত্তম বাবুর অভিনয়ে একটাও খুঁত দেখতে পাইনি। বলেছিলেন আরেকটা উত্তম হওয়া অসম্ভব। গ্রেগরি পেক স্টারডম পাবার পর ওঁর অভিনয়ে কিছু খুঁত এসে গিয়েছিল। কিন্তু উত্তম বাবুর আসে নি। এই মানুষটা শুটিং এর সময় ক্যামেরাকে পাত্তাই দিত না। উদাহরণ হিসেবে সত্যজিত বলেন নায়ক সিনেমার একটি দৃশ্যে ট্রেনের কামরায় শর্মিলা ঠাকুরকে সই দেবার সময় কলমটা উনি পাশে রাখা জলের গ্লাসে ছুঁইয়ে নিয়ে সই দেন। স্ক্রিপ্টে ছিল কলমটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে সই করার। এই পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তম বাবু উত্তরে বলেন, আপনার প্রপ ভুল ছিল। ফাউন্টেন পেনের বদলে ডট পেন দিয়েছিল। সত্যজিত বলেন, এই ছিল ওনার পারফেকশন। ছাব্বিশে জুলাই দেশ পত্রিকা উত্তম সংখ্যা প্রকাশ করলে সত্যজিত একটা প্রবন্ধ লেখেন যার শিরোনাম ছিল 'তারকা অস্তমিত'। ওঁর অভিনয় করা এক একটা ছবি নিয়ে আলাদা করে বলতে গেলে এই লেখাটা একটা পুরো বইয়ের আকার ধারণ করবে।

নেমন্তন্ন রক্ষা করতে অনাদি বন্ধুবান্ধব নিয়ে নিউ ইয়র্ক থেকে আশি সালের তেসরা সেপ্টেম্বর ময়রা স্ট্রীটের ফাঁকা বাড়িতে এসেছিল দেয়ালে ঝোলানো মহানায়কের ছবিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে।

গ্রন্থ ঋণ ঃ
UTTAM KUMAR a life in cinema by Sayandeb Chowdhury
উত্তম ছবি – সুকুমার রায় ও শৈবাল বিশ্বাস
মহানায়ক উত্তমকুমারের হারিয়ে যাওয়া ৪২ দিন—
অনাদি কুমার দত্ত ও রামকৃষ্ণ সিনহা

* Anjali-2024 প্রকাশিত লেখাটির পুনর্মুদ্রণ

সমাজ সংস্কারক শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

আলপনা ভট্টাচার্য

উনবিংশ শতক ভারতের সুবর্ণযুগ, এই যুগকে নবজাগরণের যুগ বলা হয়। এই যুগে সমগ্র ভারতে বিশেষরূপে বাংলায় বহুগুণে গুণান্বিত বহু সাধু-সজ্জন, ত্যাগী-মহাত্মা জন্মগ্রহণ করে দেশের প্রভুত কল্যাণ সাধন করেছেন। কিন্তু সামাজিক সমস্যা সমাধানে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও তাঁর প্রিয়তম শিষ্য নরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম আজও স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে ইতিহাসের পাতায়। গুরু-শিষ্য দুজনেই ধর্মের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন তা তুলনাহীন।

১৮৩৬ সালে ১৮ই ফেব্রুয়ারি বাংলার হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে সত্যাশ্রয়ী কুলীন ব্রাহ্মন খুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রমণি দেবীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব। ওনার নাম ছিল গদাধর। রামচন্দ্রের উপাসক পরিবারে জন্মপ্রাপ্ত গদাধর পরবর্তীকালে উনবিংশ শতকের এক বিখ্যাত ভারতীয় বাঙালি যোগসাধক, দার্শনিক ও ধর্মগুরু রূপে চিহ্নিত হলেন, ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন লোক-শিক্ষক। ছোট ছোট গল্প এবং প্রবচনের মাধ্যমে অতি সহজ ভাষায় সাধারন মানুষের কাছে তুলে ধরতেন কঠিন ধর্মীয় তত্ত্বকথা। ১৮৪৩ সালে পিতার দেহাবসানের পর সংসারের ভার গ্রহণ করেছিলেন তাঁর বড়ভাই রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। ইনি একজন শ্রদ্ধেয় সংস্কৃতজ্ঞ্য পণ্ডিত ও পুরোহিত। রামকুমার চট্টোপাধ্যায় কলিকাতার জানবাজারের রানী রাসমণি কর্তৃক নির্মিত দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হবার জন্য আমন্ত্রিত হন। ১৮৫৫ সালে রানী রাসমণির কালী মন্দির

প্রতিষ্ঠিত হলে গদাধরের দাদা শ্রী রামকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রধান পূজারী হন এবং ছোটভাই গদাধর দাদার সাথে এই মন্দিরে আসেন দাদাকে সাহায্য করবার জন্য। বড়দাদার কাছে কিছুকাল সংস্কৃত ভাষা এবং শাস্ত্রশিক্ষা করবার পরে ঘোষণা করলেন তিনি চাল-কলার ছাঁদা বাঁধবার জন্য বিদ্যার্জন করতে চাননা। তিনি জগতের জন্য কাজ করবার বিদ্যা শিখতে চান। যেমন কথা তেমন কাজ। বাল্যকালে পাঠশালার মুখস্ত বিদ্যা অসহ্য বোধ হওয়ায় পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ করেছিলেন। কামারপুকুরে পণ্ডিত খুদিরাম ছিলেন উচ্চশ্রেণির ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান। এঁরা ছিলেন উদারপন্থী, তাই রামকুমার কৈবর্ত (মাহিষ্য) রানী রাসমণির মা কালীর মন্দির প্রতিষ্ঠা ও অন্নভোগের অনুমতি দিয়ে অন্যান্য ব্রাহ্মণদের নিন্দনীয় হয়েছিলেন।

পারিবারিক উদারতার ফলে গদাধর বাল্যকাল থেকেই তেলী মালি ও অন্যান্য তথাকথিত নিম্নজাতির বালকদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন এবং এদের আপদে বিপদে সাহায্য করতে পিছপা হতেন না। গদাধরের এইসব বন্ধু-বান্ধব এবং এদের পরিবারের লোকজনেরা অন্তরের সাথে গদাধর কে ভালোবাসতেন, ভক্তি করতেন। গদাধর এই তথাকথিত দীনদরিদ্রদের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করতেন যার ফলে তিনি এদের সকল অভাব- অভিযোগ, অশিক্ষা এবং ঘর-গৃহস্থালির কথা, এদের সর্বপ্রকার উন্নতি ইত্যাদি নিয়ে চিন্তিত থাকতেন। অস্পৃশ্যতার কলুষ হতে দেশকে কিভাবে মুক্ত করা যায় সেবিষয়েও চিন্তা করতেন।

রামকুমারের সাথে দক্ষিণেশ্বরে এসে প্রথমদিকে গদাধর বেশ কিছুদিন আচারনিষ্ঠায় আবদ্ধ অনান্য ব্রাহ্মণদের মত মন্দিরের বাইরে গঙ্গাজলে ভাতেভাত সিদ্ধ করে খেতেন। শিবলিঙ্গ তৈরি করে মন্দিরের বাইরেই পুজো করতেন। তারপর রানীর জামাতা মথুরবাবুর আন্তরিক অনুরোধে এবং নিজের ভাগ্নে হৃদয়ের আশ্বাস বাক্যের ভরসায় তিনি শূদ্রাণী প্রতিষ্ঠিত মা কালীর মন্দিরের পুজোর ভার গ্রহণ করেন। এই গদাধরই বাল্যকালে দেশ থেকে অস্পৃশ্যতা দুর করবার আকাঙ্ক্ষায় সমগ্র পরিবারকে এক নিদারুণ পরীক্ষার সম্মুখীন করেছিলেন নিজের উপনয়ন অনুষ্ঠানে। দেশীয়প্রথা অনুযায়ী উপবীত গ্রহণকালে নবীন ব্রাহ্মণের ঝুলিতে ভিক্ষা প্রদান করবেন ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোনও জাতির মুখদর্শন করবে না। কিন্তু গদাধর উপবীত গ্রহণের সময় জিদ ধরলেন যে ধনীকামারনির হাত থেকেই সে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করবেন। পরিবারের সকলেই অনেক বোঝালো গদাধরকে, কিন্তু বালকের জিদের কাছে সবাই পরাস্ত হল। উনবিংশ শতকে অস্পৃশ্যতার ধারণা এত কঠিন ছিল যে, উচ্চবর্ণের লোকেরা তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষকে স্পর্শ করতে ঘৃণা বোধ করত। আমরা বুঝতে পারি তিনি এক উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত ছিলেন জন্মলগ্ন হতে। পরবর্তীকালে রানীর মন্দিরে পুজো করতে করতে ত্যাগ করেছিলেন সকল মিথ্যে আচারবিচার, তাইত তিনি মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন – "মা, আমার বিচার বুদ্ধির পরে বজ্রাঘাত কর"। এই মন্দিরেই লোকশিক্ষা ও আত্মার শান্তির জন্য শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তোতাপুরীর নিকটে বেদান্তের জ্ঞান এবং ভৈরবী ব্রাহ্মণীর নিকটে তন্ত্র ও যোগ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন এবং বলেন মায়ের আরাধনায়, মায়ের পুজোয় সবার সমান অধিকার। তিনি খ্রিস্টধর্ম ও মুসলমান ধর্মের সাধনা করেছিলেন, তাঁর মতে যাদের ধর্মবোধ সংকীর্ণ তারাই অন্যের ধর্মের নিন্দা করে এবং নিজের ধর্ম শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়, যারা সত্যই ঈশ্বরানুরাগী, শুধুমাত্র সাধন-ভজনই করেন, তারা কোনও ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেননা। এই জন্যেই তিনি বলতে পেরেছিলেন "যত মত তত পথ"। তিনি বলেছিলেন সরল হতে, সত্যনিষ্ঠ হতে, শিবজ্ঞ্যানে নরনারায়ণের সেবা করতে। তিনি বলেছিলেন "যত্র জীব তত্র শিব"।

অবাক হই যখন উনবিংশ শতাব্দীর এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত বিধবা বিবাহ সমর্থন করে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের কথা আমরা সকলেই জানি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে কিছু লেখবার অধিকার কিংবা যোগ্যতা আমার আছে কিনা সে বিষয়ে আমি যথেষ্ট সন্দিহান, তথাপি এই দুরূহ কাজে হাত দিয়েছি তাঁকে আরও গভীর ভাবে জানবার জন্য।

বিখ্যাত মনিষী রোঁমা রোঁলা বলেছিলেন – আমি ইউরোপের জন্য এক নবীন কমল এনেছি, এনেছি আত্মার এক নতুন বাণী ভারতের মহাসঙ্গীত। এই মহাসঙ্গীতের নাম রামকৃষ্ণ। বাংলার এক ক্ষুদ্র গ্রামের মানুষটি কান পেতে নিজের অন্তরের বাণী শুনেছেন, তাই তিনি অন্তর সমুদ্রের পথের সন্ধান পেয়েছিলেন। রোঁমা রোঁলার এই বক্তব্য অবশ্যই বাস্তবিক।

সেই যুগে কিংবা এযুগেও কোন ধর্মগুরু সম্ভবত "যত মত তত পথ" কিংবা "সর্বধর্ম সমন্বয়" এর কথা বলা দুরের কথা, চিন্তাও করতে পারেননি। ঋষি অরবিন্দ বলেছেন -পাঁচশত বৎসরের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মত দ্বিতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব পৃথিবী সহ্য করতে পারবে না। তাঁর চিন্তার প্রাচুর্য যা তিনি রেখে গেছেন তা আমাদের কাজের মধ্যে রূপান্তরিত করতে হবে, ঐশী শক্তির প্রেরণাকে প্রাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন –

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এজগতে
দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।

ঠাকুর, মা ও স্বামীজির চরণে সহস্র কোটী প্রণাম জানাই।

ঋণ স্বীকার-

১. বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ - উদ্বোধন কার্যালয়
২. কবি শ্রীরামকৃষ্ণ – অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত
৩. শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ ও দেশ – ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ রায়

THEN and NOW

Rita Kar

I have a love-hate relationship with Facebook.
I love it because it has connected me to my past. It has brought back memories of my childhood, my youth, and people who had once been an important part of my life but with whom I had somehow lost touch. Old friends, colleagues, familiar faces—all suddenly reappearing on my screen after years, sometimes even decades.
And then there is one Facebook feature I particularly enjoy:
"Then and Now."
Every once in a while, Facebook shows you a photograph from the past and invites you to add a picture from the present. I love looking at these little time capsules. It is fascinating to see how friends, colleagues, and family members have changed over the years—especially those we have not seen for a long time. Sometimes the changes are dramatic. Sometimes, despite the years, the smile is the same.
This made me wonder.
Why not a little "Then and Now" of our Puja?
Because our Puja has also changed over the years. But through all these changes, something has remained the same: the excitement, the friendships, the chaos, the laughter—and that unmistakable feeling that Durga Puja has arrived.
And so, for this issue of Anjali, I thought of looking back at our Puja—not just through old photographs. To see where we began, how we have grown, what has changed, and what has remained wonderfully, reassuringly the same.
So, let us scroll back through our own memories.

Tokyo Durga Puja: Then and Now.
Same Puja. Different photographs.
And, thankfully, much better cameras.

THEN		NOW
	*(Puja Celebrations)*	
	*(BATJ Ladies)*	
	*(Rehersals)*	

“Vande Mataram”– The Song That Woke Our Nation

Manikchandra Ghosh

Vande Mataram!

It is our national song that has made an immense contribution to our country’s freedom struggle and independence.

This year our nation is celebrating the 150th anniversary of this great inspirational patriotic national song, “Vande Mataram”.

It was originally composed by Bankim Chandra Chatterjee and published in the literary journal ‘Banga Darshan’ on 7th November, 1875. The song gave voice to a profound understanding of patriotism by elevating the motherland to the status of a mother. It is the song that woke our nation.

At the time of its composition, because of the British ruler’s extreme inhuman mistreatment, the sufferings of people reached to an extreme, but neither could one raise their voice against the British, nor could one think of how to overcome it. Going for an organized protest movement was beyond their imagination. As at that time, even the concept of nationalism was not yet crystallized among them.

In that pre-independence era, in 1882, Bankim Chandra Chatterjee incorporated the earlier published “Vande Mataram” song into his novel ‘Anandamath’ with a noble purpose.

The purpose was to introduce his concept of nationalism based on ancient Indian culture and traditional values on the one hand, and as a responsible son of the land, to demonstrate his concept of freedom movement, including drawing up the route map for uplifting our country from the unacceptable miserable state to the path of prosperity on the other hand.

In his novel, the motherland is envisioned primarily as Goddess Durga, flanked by Lakshmi for wealth, Saraswati for knowledge, Kartikaya for skilful warrior and Ganesha for success. Together, they symbolize the imagery of what India needs for positive transformation.

The novel, ‘Anandamath’ highlights that true prosperity cannot be achieved through any single attribute of wealth, knowledge, strength, and success alone. Our country requires the collective converged effect of all these core constituents and resources to embody complete strength, abundance, and ultimate prosperity. ‘Anandamath’ shows the roadmap for achieving the vision and mission that is articulated in “Vande Mataram.”

In other words, “Vande Mataram” and ‘Anandamath’ are basically deeply intertwined, just as the Vedas and Vedanta are inseparable. The true meaning and the philosophical concept that is embedded in our national song cannot be understood well without understanding the true spirit of nationalism, devotion, and metaphorical imagery of Goddess Durga that is depicted in the novel, ‘Anandamath’.

In a true sense, “Vande Mataram” is far more than an embodiment of the beautiful and blissful scenic nature of our country. It is, in fact, a wholehearted national song that treasures Indian tradition, culture, and values and upholds Indian real spirits. It has many dimensions and several missions and visions are embedded in it.

It is perhaps the earliest song in the 1800’s that first taught India how to dream of independence, overcoming the miserable and painful state of our life and ending the British Raj. Every word was so meticulously chosen by Bakim Chandra that it easily echoed in every Indian heart, inspiring them to go for freedom and transform the collective localized anti-colonial sentiment into a unified, nationwide struggle for independence.

It is the only prime song in that era that merged ancient Indian principles and ethics with modern thoughts and ignited every mind with a new consciousness of ancient culture and sowed the seed of nationalism through increased awareness of the urgent need for national identity, unity, and Indian values.

It is the foremost song that changes our concept of the nation from a mere geographical territory to a sacred, loving entity equated with our divine mother and asks everyone to be sincere to her with devotion, service, and sacrifice.

Throughout the independence movement, the song served as an ideological catalyst.

During the freedom struggle, the song, “Vande Mataram” became the nerve centre for the Indian freedom movement and became the core source of inspiration among the freedom fighters. The profound impact of the song is therefore evident on almost every important phase of the Indian history of independence.

In the 1896 Calcutta Congress session, Rabindranath sang the song for the first time in public. It subsequently became a customary practice to open every Indian National Congress assembly and political rally by singing “Vande Mataram”.

During the Swadeshi Movement in 1905, the song became a political weapon and the Swadeshi Movement became so strong that it forced the British to revoke their decision to partition Bengal.

The song, “Vande Mataram” gave rise to revolutionary journalism and literature that shaped the intellectual back-

bone of the resistance. For instance, Sri Aurobindo Ghosh translated the song into English prose and verse, calling "Vande Mataram" the supreme mantra of nationalism that gave India a living soul into English. His English translation was published on 20th November, 1909.

On 6th August, 1906, a nationalist newspaper, "Bande Mataram" was published and Bipin Chandra Pal was its editor.

Lala Lajpat Rai published the Punjabi newspaper titled "Vande Mataram" from Lahore.

The legendary Tamil poet, Subramania Bharati translated the "Vande Mataram" into Tamil.

In 1907, Madam Bhikaji Cama raised the tricolour flag with an inscription of "Vande Mataram" for the first time outside India in Stuttgart, Berlin.

Khudiram Bose sacrificed his life for our country by chanting, "Vande Matarm" on 11th August, 1908. Subsequently, similar footsteps were followed by many freedom fighters. Madanlal Dhingra, Ram Prasad Bismil, Ashfaqulla Khan, etc., are a few of such names.

Masterda Surya Sen and his peers, inspired by both "Anandamath" and "Vande Mataram",viewed the fight for India as a sacred duty. He led the famous 1930 Chittagong Armory Raid. On 12th January, 1934, in Chittagong jail, Masterda Surya Sen was executed by the British Raj. Historical accounts note that the British inflicted severe torture on him before his hanging—breaking his teeth and pulling out his nails—to prevent him from shouting the patriotic slogan. Despite the brutal treatment, his legacy remains tied to the fearless spirit of "Vande Mataram."

On 8th December, 1930, Binoy Krishna Basu, Badal Gupta, and Dinesh Gupta attacked The Writers' Building. Their sacrifice became a symbol of fearless patriotism in Bengal's freedom movement.

The British administration banned chanting or singing of "Vande Mataram" in public. In 1942, a 73-year-old Gandhian leader, Matangini Hazra, led a protest march during the Quit India Movement. Even after being shot multiple times by British police, she died holding the tricolour flag aloft, chanting "Vande Mataram" until her last breath.

Indeed, the song, "Vande Mataram" has a great contribution to the freedom struggle. In recognition of its monumental role in the freedom struggle, the Constituent Assembly, led by Dr. Rajendra Prasad, adopted the first two stanzas of "Vande Mataram" as India's National Song on 24th January, 1950, granting it equal status with the National Anthem.

To honour "Vande Mataram" as a milestone in Indian history, the Government of India is organizing year-long celebrations from 7th November, 2025, to 7th November, 2026. In a historic move, the Prime Minister has approved the use of all six stanzas of the song for official government functions and government events.

In a nutshell, this article recollects Bankim Chandra Chatterjee's creation of "Vande Mataram," highlighting its role from the inception of the freedom struggle to India's independence and its universal appeal for devotion to the motherland. The entire lyric of the song is so thought-provoking and powerful that it resonates with every heart and awakens India as a whole. The metaphorical imagery of our divine Goddess, Durga, equating with our motherland is found to be unprecedented, incomparable, and unique. This imagery is even found very relevant today because it shows clearly what we need to transform India and its further advancement and what we need to do for success. In this token, we, therefore, express our heartfelt gratitude to Bankim Chandra Chatterjee and all freedom fighters who sacrificed their lives for our beloved motherland. Through the celebration of the autumn festival, we offer our deepest devotion to Goddess Durga and to our motherland, praying for the peace and well-being of all.

Vande Mataram!

Reference:

1. "150 Years of Vande Mataram -A melody That became Movement "Backgrounders- Press Information Bureau, Government of India, 6th Nov.,2025.
2. " প্রতিমা দর্শন আনন্দ মঠে" by Manikchandra Ghosh, Anjali Magazine BATJ, [www.batj.org] 2018, Page 31
3. https://x.com/DDNewslive/status/1998088585648746496
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Surya_Sen
5. https://www.youtube.com/watch?v=Bf7_VJt2rQ8

A Hospital Visit in Korea

Mita Mukhopadhyay

I was going to tell you about our ski trip to Yongpyang resort north of Seoul, the site of the 2018 Winter Olympics. I was going to describe the ordeal poor George, our colleague from Cyprus, had to face in locating the resort – how he drove us around the city in circles with directions given by the MBA office. I was going to tell you how we stopped at gas stations, at pharmacies, asking for Hwy 50, and how we were sent in different directions, how one of our Bengali friends finally directed us out of Seoul by phone. I would have described how and why our trip took us eight hours to complete instead of the supposed two and a half hours. Instead, I decided I would write about my experience at a hospital here.

A new law for issuing E-2 visas to English teachers requires two documents – a health certificate from a designated hospital with the results of a "TBPE test and an HIV test", and a "Criminal record report" from the local police station of one's home country. Almost 99.9% of the teachers here are from "English" speaking nations - the UK, the US, Australia, South Africa etc., so you can make of this new requirement what you will.

I decided to go to Samsung Hospital for the required tests, as was required by SKK GSB University where I taught. Veronica, our office liaison, called the hospital for details and informed me that I should go in early as the clinic closed at 11:00 am, and yes, I would need to fast for the tests. I had dinner early the night before and not a drop of water after midnight. The hospital, we were told, "was just outside the subway station" but it took us a while to locate.

Inside the elevator we discovered there was no button for floor 16. An annoying thing in Korea is that some elevators have odd-numbered stops. On Floor 16, we looked and walked around feeling very lost and when we finally located the place, it was 9:00 am.

Three uniformed young women sat smiling pleasantly at the information desk. Veronica had asked us to say we were from SKK University and had come for the medical tests required for E-2 visas. Samar and I kept saying E-2 visa, showing them the requirement list with the tests highlighted, then said Sungkyunkwan Dehaigo (university in Korean) and the girls kept smiling and nodding. They spoke to each other in Korean, nodded vigorously again, then gave us a form to fill out.

The form is the kind one fills out at a first hospital visit. This one asked if any of my relatives had been "illed or dead from any of the illnesses listed below". The illnesses were the usual ones of course, to which I marked a "no" as I had been asked to "Mark check without exception". I was then asked if I had "any suspicious ailments to my health". Should I have put down "tingling toes" I wondered? "What kinds of food do you often enjoy?" They wanted to know next and I had three choices: "I like often vegetables", "I like evenly vegetables and meat", or "I like often meat".

Next, the form got quite casual and friendly, asking "How about your drinking habits?" Not wanting to lie, I chose "I drink 2-3 times per month". Then came the next question "If you drink, how much you drink" They actually wanted to know if I drank half bottles or full bottles of "soju," the Korean killer drink! From drinking we went on to smoking, without any problems, but when they asked about my exercise habits, I was a trifle perplexed. "How many times do you exercise vigorously excessive sweating per week?" or "Did you have any mental or physical difficulties this past month?"

Samar paid 90,000 won (equal to about $90.00) for the tests, and I was handed another form and sent to a room marked "locker". I was given a t-shirt and housecoat to wear. "Leave my underwear on?" I asked, using some words and some gestures. "Yes", was the answer. So, I took off my clothes, wore the T-shirt, and slipped the housecoat on. My bare legs showed under the wrap, but I didn't think much of it. I put my bag and my clothes in the locker and waddled over to the waiting room in my boots. A little group of us in identical green printed housecoats waited for various tests. The men all wore identical pajamas under their housecoats. I seemed to be the only foreigner in the group.

When they called out a funny sounding name I knew that was mine. I was sent to Room 1. The young girl sitting at a table asked me to stand on a long treadmill like equipment, to which a height measurement ruler was attached. She pushed a button, and a clamp descended on my head. My height and weight appeared on a monitor. Strangely, since moving here, an even exchange had occurred. I was shorter by 2 inches, chubbier by 2lbs!!! The girl now asked something in Korean. I spoke gibberish too, in English. Soon an elderly man was at our side asking in English if he could help. He was a God send! I told him I was there for a TBPE (??) test and an HIV test and did not understand why all this was needed. The man nodded as if to a child, asked for my blood type (which shamefully I did not know) and then said I would need an eye exam!

Next, I was directed to room 2 for a color test or whatever it is called in medical terms. Again I protested, but again, all I got were pitying looks. Three other rooms later, my blood pressure, hearing, teeth, had all been tested, checked or looked at. The elderly English speaking gentleman had looked at my teeth and declared they needed cleaning. He would not hear of the TBPE or HIV tests.

So, on I plodded to the next room. I was asked to lie down on a hospital bed and untie the wrap. I did so and the nurse shrieked. She quickly covered me up and ran out of the room. She ran in with a pair of printed men's pajamas and ordered me to wear them. I understood now why I was the odd one out with my legs showing – the women had left their trousers on! I had done the unthinkable by exposing my legs even though my modesty was covered! I was too embarrassed to notice what she did, but I got the feeling that a number of cold metallic objects were placed all over my body for heaven knows what reason (TBPE??). Next, another woman ordered me to take off my bra for an X-ray. I was too bemused by now to even mention the HIV or TBPE tests.

Room 7 was for my blood and urine samples. Ah, I thought, finally my TBPE and HIV tests. I was given a cup and a small strip of litmus like paper with colored stripes on it. I was told to dip the strip of paper in the cup of urine and bring only the strip back. Very advanced, I thought. So, I dutifully did as I was told and handed the strip back to the technician. They took about three to four vials of blood and I was sent to Room 8.

In Room 8 was a lovely young woman doctor. She giggled as she asked if I spoke Korean and giggled again at my answer. She herself spoke just a few words of English. She looked at the form that every technician had marked and declared that my results showed I was in good health. What about TBPE and HIV tests I asked? Are they going to check for that? She frowned. The form did not have any spot for it. I explained as best as I could what I had come there for. She giggled and told me to wait.

Soon, she was back. The women at the information desk had not understood what I needed, she said, so those tests had not been performed. I would need to pay 35,000 won more for those tests. Samar and I went to the desk with the young doctor and we paid our money. I told the doctor that I would test positive for TBPE since I was inoculated against TB as a child. She laughed, "Oh, but this is not a TB test, it's a drug test."

Of course they would need a urine sample for the Drug test, but I had just exhausted my output a few minutes ago. The doctor had a suggestion. "Drink much water, and put much pressure" she demonstrated just a bit, "and maybe you will get some". Dutifully, I drank several little cups of water. Actually, they don't use cups here, but little paper bags. I kept downing the water, and the clock kept ticking. It was 10:40 now and the place closed at 11:00 am. I've never been this desperate to use the toilet in my life. Soon the room started emptying, and Samar and I were the only ones left. The clock showed 10:45. Someone brought a tea bag and a small paper cup for me. I extracted two cups of lukewarm tea from the bag and kept waiting. At 10:50 I decided to see if all the pressure had paid off.

At exactly 11:00 am I handed the little cup back with a modest sample. Thankfully, when the results came in on Friday there were no further problems. I was clean!

Saudade

/saʊˈdaːdə/
noun
a feeling of longing, melancholy, or nostalgia

Shruti Upadhaya

The nursing home that I was born in is seeing its final days. Park Site Nursing Home was where my father and his two brothers, and eventually me and my two cousins were born. I used to be chronically sick as a child. Sometimes I was affected with a cold and cough that refused to leave me, sometimes I was down with fever so bad only nurses doing a saline intravenous was how I would get fluids into my body, repeated nebulizations. It all happened here. And one fine day, I stopped going there. I grew up, developed better immunity just as my paediatrician had promised my very easily worried mother, and just like that my repeated visits ended.

At the time and even until now before I got this information, I hadn't been able to adequately gauge what it means for things to be truly impermanent. My repeated visits there were tiresome, overwhelming, irritating and on an odd occasion even painful, but there was one thing that made all this bearable each time I went there. The nurses and the general staff. Now all of my repeated visits happened during the ages of 3 to 8 years. At a time like that, when most things happening within and around a child are beyond their coherence, the nurses to me acted like angels. They were always there when I got too worked up, when I was scared of the nebu-

lizer, when I wasn't sure about when I could go back home, or when I needed more reassurance than what my parents were providing me with. They became my best buddies. After having spent so much time at that place consecutively, I started finding corners that I liked in those two storeys. I liked how open the windows were, allowing so much light in, I liked how I could travel from one room to another (there were only three rooms on the floor I was on) and how the layout being the same in all three used to boggle my mind. I liked how neatly the medical instruments used to be kept. Everyday in use and yet never out of order. I loved the precision with which the nurses used to work.

I can't recall the purpose or the happenings of my last visit. One thing that I must've thought for sure was that it most certainly wouldn't be my last time visiting. This lack of remembrance is very unsettling. It's as if I'm losing the one final thread that is tying me to that place. I never saw any of those kind nurses again. I never stepped inside after that. It never occurred to me that even though little, but one day, there could be a possibility of this small building with all of its glory of converting most sick people to healthy ones over a span of I-don't-even-know-how-many years is going to just; go. One of the reasons I'm writing this is maybe also because I'm scared to lose these remaining crumbs of minutiae of the place that taught me most about being emotionally present for people. It feels like slowly, some witnesses of my childhood are now fighting to survive, a battle that this nursing home lost.

It's very common for children to hear from their elders, things like "This area has turned unrecognisable." or "I miss the place that used to be here before they made this building.". As I sometimes walk past old lanes that I used to frequently go through as a child, I get a similar bittersweet (mostly bitter) feeling. It's less like a wave and more like a slap of realisation that I am not a child anymore. All the places that made my childhood endurable are slowly going away like a permanently receding tide. It's beyond my capacity to stop them from doing so.

We get so attached to things, buildings, people and places to the point where their silent departure nearly rattles our lives. We suddenly become more aware of all the things that we've lost up until that point. In my case it also made me think of many such departures. A nearly non-verbal introvert in my school who used to sit beside me and each day, tried her best to keep up with class. I remember being mad at her sometimes for her lack of responding when I tried to help her with lessons but I always ended up feeling bad and apologised. She understood my stance I could tell, for she never got offended at my ways despite me being irritated at her silence from time to time. I miss her now as I sit here unaware of her whereabouts.

My pre nursery school St. Mary's doesn't exist anymore. It is now sometimes a cafe, sometimes a patisserie and sometimes something else. I used to be quite the crybaby back then and would get very upset when my mother had to leave me in school. Sita miss, our head teacher back then used to be very patient with me despite me taking the longest time to stop crying for my mother. She was the first person in my life who was determined to believe that I was destined to do great things. I don't know how true that turned out to be or if it'll ever be true but one thing definitely happened. I started to see that my different way of doing things didn't mean I was wrong. I was just like everybody else. Different. That brought a generous amount of ease in me. The building that contained all of her outstanding personality and all of my comfort around her presence doesn't exist anymore.

My primary school branch (now shifted to a different area) has been transformed into an office. I studied grade one to three over there. If you may recall, during this period I was still in that age group of having my frequent nursing home visits. This was the place where I met my headmistress for the first time. The second person in my life who appeared to take special interest in me and my ways. Or maybe she was just a good headmistress who paid attention to every child. Whatever the case may be, her belief in me was very instrumental in me lessening the attributes of my very poor self-esteem. Post third grade, I never stepped foot in that building again. I was 8 when I left and I have missed it ever since.

There are many more such places, people and incidents that have played massive roles in shaping the person that I am today. So many people believed in me, friends and elders, some who are and some who aren't in my life anymore. So many beautiful places that I grew up around. I am now scared of losing them slowly because it has now finally been solidified that people leave, die, change and old places are dismantled and new places are built. They take with them a part of us that they helped nurture. A part of us that'll remain indebted to them forever.

It is maybe for the best. Whether true or not, for now, this thought is the only one that remains easily palatable to me. I don't know why it may be for the best. All I know is that, just like many other inconveniences in life, I'll learn to live with this too. Time doesn't heal anything afterall, it only teaches us how to gradually live better with the same amount of grief. It'll teach me to live with this too.

Are We Alone?

"Space, the final frontier..." this was the signature statement of all Star Trek episodes.

Viswa Ghosh

Our Cosmic Solitude

At the age of 35, in 1896, Rabindranath Tagore wrote about our cosmic solitude: *"In this great void... humans alone drift through it..."* **(মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে...)**. Tagore was articulating a sentiment that modern cosmology in the 20th and 21st centuries would revisit again and again: so far it seems, we are indeed the lone observers in an immense, mostly dark and ever-expanding universe — and that very solitude can feel both terrifying and humbling.

Terrifying because, a night will come when stars will no longer be visible in our night skies as these stars would have moved away faster, than light from those stars can travel toward us. Terrifying also because, as Carl Sagan once said, if we are the lone civilization surviving on this beautiful blue planet called Earth, then we have a heavy moral responsibility to protect what we have. We are challenged to improve ourselves, learn from the mistakes of our ancestors, and behave like responsible stewards of what we inherited.

Humbling because all our vainglorious mannerisms and pompous posturing are incomprehensibly insignificant given the vastness of our universe — a universe which may have given birth to 100s of millions, if not billions, of other intelligent civilizations across trillions of galaxies, galaxies that are being gradually revealed to us by the Hubble and James Webb telescopes.

Our Origins: From the African Savannas

Our immediate ancestors emerged in the **Great Rift Valley of Africa** nearly 200,000 years ago. This massive trench runs **6,000 kilometers** along Africa's east coast, from the Middle East to Mozambique, and is home to deep lakes, volcanoes, and the oldest Homo sapiens sapiens' skulls ever discovered.



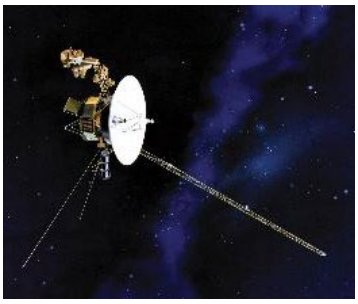


Great Rift Valley runs 6,000 kms along the African east coast from Middle East to Mozambique

It took us modern humans about **60,000 to 70,000 years** to emerge out of the African savannas and settle every continent. It has been an extraordinary journey thus far — from the cradle of humanity in the African savannas to the edge of interstellar space.

We Have Reached Out

NASA launched **Voyager 2** on August 20th, 1977, and **Voyager 1** on September 5th, 1977. For nearly 50 years, these twin spacecrafts have wandered through our solar system. Both have now moved beyond our Sun's heliosphere into **interstellar space** — the immensely more dangerous realm between solar systems where our Sun's electromagnetic bubble no longer provides any protection.



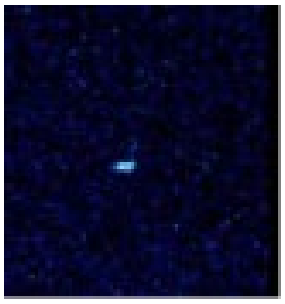


Image of Voyager that looked at the "Pale Blue Dot" from six billion kms away on Feb 14th, 1990

Voyager 1 is about **25.9 billion kilometers** from Earth

Voyager 2 is about **21 billion kilometers** from Earth

In humility, we reached out into space hoping someone out there will feel and touch our outstretched fingers. Our hands have remained stretched out for nearly 50 years now, but we haven't yet felt the slightest sensation from which we could conclude the presence of another intelligent civilization.

On **February 14th, 1990**, Voyager 1 turned its cameras back toward home and captured the iconic **"Pale Blue Dot"** image — our home, the Earth, appeared like a tiny speck suspended in a sunbeam, from six billion kilometers away. It remains one of the most humbling images ever taken.

Where are they now?

Traveling at about **144,000 kilometers per hour**, Voyager 1 is drifting through the **Ophiuchus constellation** — "The Serpent Bearer," catalogued by the Greek astronomer Ptol-

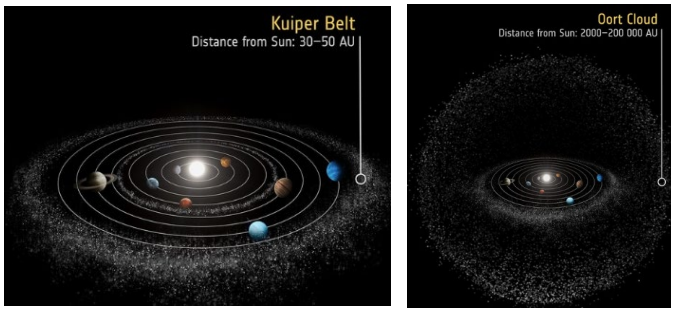




Greek astronomer Ptolemy catalogued over 2000 years ago

emy over 2,000 years ago. In **60,000 years**, it will have completely exited the **Oort Cloud**, leaving the final gravitational boundaries of our solar system behind. By then, the craft will have completed its closest approach to the red dwarf star **Gliese 445**, currently **17.1 light-years** (161.8 trillion kilometers) from our Sun.

Voyager 2, traveling at about **120,000 kilometers per hour,** is heading in the direction of our neighboring galaxy, **Andromeda** — whose collision with our own **Milky Way** has already begun as the two outer halos have started interacting. After passing the red dwarf star **Ross 248**, by about **61,000 years** Voyager 2 will have gone past the outermost



1 AU = 149.6million kilometers, which means the Kuiper Belt is about 4.5~7.5billion kilometers and Oort cloud is about 29.9billion~29.9trillion kilometers from our Sun

edge of the Oort Cloud (Oort Cloud is the true **final frontier** of our solar system — a ghostly halo of primordial ice).

The time it took modern humans to leave the African savannas and settle every continent — the two crafts will take the same time to move close to distant solar systems.

The Technology That Carries Our Hope

Notwithstanding the success that the two crafts have proved to be, the technologies they carry onboard are remarkably simple compared with the mobile phones we hold in our palms today.

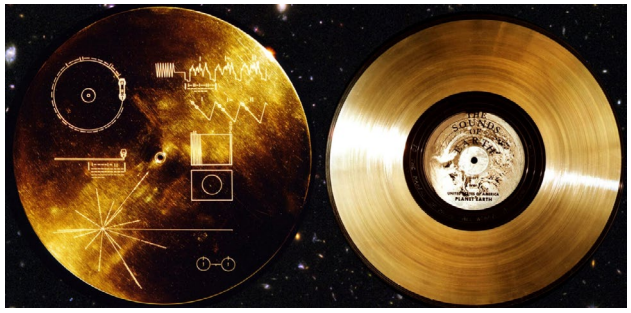
Technology	Voyager	iPhone
RAM	~ 69KB	8GB
Storage	~ 69KB	256GB
Processing Speed	~ 0.08 MIPS	3,500,000 MIPS
Note: While our modern iPhone can run the entire Voyager mission software millions of times, it goes without saying that Voyager was built for reliability and robustness, to survive a hostile spacescape		

To power the instruments onboard each craft, about **470 watts** were needed at launch in 1977. Currently, the two crafts can power instruments up to **240 watts**. NASA mission control has, therefore, shut down most instruments to keep operating the two most important: the **Magnetometer** and the **Plasma Wave Subsystem**.

Our Bronze-Age Values vs. Our Twenty-First Century Technologies

As we bask under our **stone-age and bronze-age values**, we prove ourselves incapable of managing the vastly powerful and threatening technologies we have unleashed upon ourselves and on our home, the blue planet.

During the decades when we have committed **genocide**



Humanity's message etched in gold (gold-plated copper), because gold is one of the most chemically inert and corrosion-resistant yet known to us: Etched with instructions for playback - How to use the stylus, the proper rotation speed (3.6 seconds/revolution), and the hydrogen atom transition timing that serves as a universal clock reference. Cosmic rays will slowly cause atomic displacement and knock atoms loose.

after genocide, causing the death of hundreds of millions of people and billions of other species on our fragile planet, our two human-made vehicles have been educating us about our solar system and also about our place within our galaxy and this ever-expanding universe.

Our two crafts, Voyager-1 and Voyager-2, are carrying **golden records** of our civilization's past (the proverbial, message in a bottle) — samples of all the sublime achievements of our civilization: music, poetry, paintings, greetings in 55 languages, and the sounds of Earth. Our two Voyagers will hopefully chance upon another intelligent civilization that has lived long and achieved galactic travel capabilities. And, after learning about us, will hopefully seek us out to build a friendship that may yet make us more human than we are today.

Epilogue: The Faintest Signal

The Voyagers sail on. Their power dwindles now, watt by watt, like a candle burning down in an endless meditation hall. By **2030**, perhaps sooner, their instruments will fall silent one by one. The high-gain antenna will cease its patient sweep, no longer searching for a lock on a pale blue point of light lost somewhere behind the Sun's glare. They will become, in essence, **drifting tombstones at high velocity** — artifacts of a species that once looked up and wondered, and decided to reach out.

But here is the strange mercy of science: even in silence, they continue their work. The golden records still spin in the vacuum, their grooves carrying the natural sounds of rain, thunder and birds, of Bach, of a mother's kiss, a Peruvian wedding song, diagrams of human anatomy and greetings in 55 languages. The records will outlast the spacecraft. They will outlast our Sun's stable middle age. They may outlast us — humanity's future is not guaranteed, as Sagan well knew.

In 60,000 years, when Voyager 1 drifts past Gliese 445, the sky above Earth will be unrecognizable. The constellations will have shifted. The Andromeda galaxy will loom larg-

er, its spiral arms already distorting from the gravitational pull of our own. Perhaps some descendant of ours — biological, mechanical, or something unimagined — will still exist. Perhaps not. The craft will not know. It was never built to know. It was built to **ask**.

And that, finally, is what saves the terror from consuming us. Tagore, alone in his cosmic meditation, understood this. Carl Sagan, staring at the pale blue dot, understood this too. The universe does not owe us companionship. It does not owe us meaning. But we owe ourselves the dignity of the question. We owe ourselves the reach.

The fingers remain outstretched. The darkness remains vast. And somewhere, in the hum of a 3.7-meter dish pointed at nothing, in the decay of plutonium turning warmth into whispers of electricity, in the silent spin of a record no one may ever play — there persists the most human thing of all: we did not look away.

Our scientific mind looked up at the sky and wondered, and dreamt, and begged humanity to invest more in **education, health, and scientific inquir**y rather than weapons of mass destruction, and in never-ending wars of power and hegemony.

For the golden record, and for all who wonder — the journey will hopefully continue as we become more and more scientific in mind and temper, junk our stone-age and bronze-age values and create 21st century ones.

Winning Yoga

Sougata Mallik

It was the kind of Sunday evening that lingers long after the sun goes down. I attribute it to the phone ring and on the other side the voice of my school friend. The sound felt like a fervent breathe-in. We have been friends and fellow striders since Grade 2 in school, to the Master's degree program in University. A long association – rather rare in terms of time.

My friend sounded the same as I have known her all these years, perhaps a little thicker in tone due to progression of age. Yet the enthusiasm and effervescence in her tenor was still intact. With usual eagerness in attitude, she jumped straight to the topic. "Why don't we meet one of these weekends? I am longing for a good dinner and a friends' catch-up." She automatically takes the prerogative of friendship to call me, her friend in Toronto, Canada for a weekend friends' get-together in Houston, USA.

And so I start on a small voyage, pack my bags and take the flight from Toronto to Houston. My friend had planned a relaxing itinerary. There were visits to the arboretum, museum, watch a new movie release, fine dining, shopping. All were reposeful, along with the pleasant catch-up of our school days, University days, our children, families and so many more conversations.

The final item on the itinerary was a Yoga session for a relaxing time. My friend had earlier attended such sessions and had been an admirer of their practices. But the last interest on the itinerary my friend had devised, discomforted me. Why Yoga on a relaxing weekend spree, especially for me, a labelled non-exercising, non-sports individual! I eat healthy, live healthy, and am comfortable with this lifestyle. But my friend insisted that the Yoga retreat will be relaxing, and moreover the booking had already been finalized.

On reaching the Yoga centre, we were greeted by a friendly concierge, a welcome herbal tea and were ushered to the preparatory area. There was a short 10-minute video presentation at the start. I was baffled and scared.

I was worried and didn't fathom which class or session can bend my arms and legs to grasp the angle that is required for good breathing. I was terrified right at the beginning. How can I bring my knees up to my shoulders, exercise arm balance or lift a foot off the ground? I will have to defy physics! But without any choice I was led to the Yoga session room. What followed was nothing less than a documentation of my misery.

I distressfully tried to imitate the teacher, the fellow Yoga participants and my friend. Instructions were to raise the leg and arch as a hawk, like when it is perched on trees and resting. When I tried, my legs couldn't move. I fumbled. I tried dutifully again, and without doubt I had defied gravity. I plopped on the ground in a pitiful manner.

A sigh and concerned hum of tone enveloped the room. The disaster I had caused was enough to break the solemn silence of yoga practice that was being followed in the room. The teacher instantly traded me from a mat to a chair. There I sat – a lone yoga practitioner sitting on a chair while the rest occupied a mat on the floor laid out for every individual. The teacher pushed me to the side of the chair, my body bent in an angle, my elbow resting on a bent leg, the other stretched over the head. But.... little did the teacher know about my caving, non-exercised body. I tumbled again!

A combined sigh in the room recurred. This time the sigh was added from the teacher and my friend. With a startle in her eyes and rebuke in her voice, she spurted out "What are you doing?!"

By now I had become self-determined, resolute to suc-

ceed, gain my deference and esteem back in the session. I just cannot be the lone disaster anymore, amidst a room full of committed yoga practitioners. While the teacher instructed and all participants followed, I did too. But I mixed it with my own yoga moves and postures punctuated with safety and straightforwardness of use. When participants were pushing their right arm to touch the back left shoulder to focus on arm balance and back extension as instructed by the teacher, I was touching both my shoulders with both my arms at ease and effortlessly. I was not going to fall again and be the spectacle that I was a few minutes ago. I finally followed yoga postures with safety and completed the session without any further dismay. I felt proud and satisfied.

The feeling was like hitting the bull's eye or tossing a torpedo. You don't know how far the arrow will go or where your target will land. But you have done your best. You have taken the stride, stayed committed to the purpose, aimed sincerely at success. I was a triumph in my own way.

For long I had understood yoga to be about external posture and exercise technique. But as I stuck around in the session, I realized it can also be a union between the movement and determination, between body and spirit, self and universe. Once the mind is clear and the muscle moves, whether you are sitting on a chair or on a mat, the yoga experience can unravel something even deeper – that is your own will and fortitude.

For me, the whole yoga experience turned out like an excavation. Linking my intent with a crusade to accomplish showed the path to new discovery. Occasionally it is the physical manifestation that can uncover something indefinable. Here the yoga practice had taught me not to compare myself with others in moments of adversity. On the other hand, it also offered me the erudition that the presence of other contenders had aided me to stay centred. Thus, my yoga practice became a calm experience, relaxing and peaceful.

I felt immensely happy that I did not give up. I had battled it to achieve a somewhat feasible result and had picked up from where it was left. Though it was nowhere close to 100% but was certainly far from being a zero.

Finally, it was time for me to go homeward. When I sat in the aircraft, about to take off to the sky, I felt comfortable. It seemed my entire skeleton had realigned. I had come on the trip to have a good time, and I was also returning with good vibrations. And, adding to it was a physical recognition in my hand. It was a decorative, artistic paper and a certificate that glowed, 'Awarded for completion of one-hour Yoga session'!

Sometimes in life you only have to take a deep breath..... and that just makes it all up.

How do my people live?

Udita Ghosh

It's not that our skin is browned—
It's that we were treated like dirt
Over and over again,
Until we submitted and learned "our place"
And accepted that we get
Nothing just by right;

Every broken sidewalk,
Falling bridge, leaking ceiling
Blinking streetlight,
Stained wall, trashed park
Overflowing pothole
Piled up dumpsite
Tells us again and again
That you will still live within this,
That you deserve no better;
That you will be treated
Like bugs and ants
And still only fight amongst each other,
Unless you streak ahead
To slip past the fortress walls
That enclose our futures in silence,

At a planetary scale
Weighted down
Only towards violence,
Keeping wealth and whiteness,
And the chance to be deemed human,
At the other end of the scale,
So that with rote
The everyday violence of poverty
Can feel more and more like fate.

My people live in daily ingenuity,
Wearing garbage bags in the rain
Maneuvering arms through cutout holes;
Wading through annually flooded roads
Hugging books to their bodies
Clutching slippers in one hand, soaked;
Dragging discarded cartons as toys,
Through the mockery of childhood,
- Of motherhood under duress,
- Of fathers with broken bones,
Who lift bricks, build floors,
While the mothers smack the kids away
(Because he fell and hurt his head at work)
To not agitate his fading mind in disarray.

So my people patch things together,
They build rooms atop dump yards,
Grow plants on the side,
Forage amidst the trash,
Add a wire to the pole
To pull in some light,
Throw stones in the flooded road
To pebble an island across
And nurse pets who will chase
The snakes away at night.

Because making do is the
Name of the game,
And "jugaad" the anthem of our lot.
Between those who rule us from afar,
Or the near leaders who keep
Selling off our parts,
They agreed to let our lives
Be worth nothing at all.

"Jugaad" means to be worthless
On a global scale,
And to be so systematically
Devalued and dehumanized,
That you lay down your arms
And let your dreams be colonized.

Ma ‘ er Aanchal

Joyita Basu Dutta

How can I forget the snug comfort of your “kol” - the easy slumber on your lap?
Your unstarched cotton saris cocooned me in their soft pastel hues.
I remember a particular lemony shade, so distinct from the usual light blues and pinks.
Your crisp taanter sari which when soaked long enough transformed to gentle surrender.
When I was a child, you considered me an extension of your aanchal!
I followed you around everywhere and I was always dutifully behind you.
That morning I was as usual tottering right behind you when accidentally,
A tub of boiling hot water slipped out of your hands and onto our feet.
Despite your own pain, you didn’t waste a second to carry me to safety.
Covered in blisters and Burnol, it didn’t deter me from resuming what I did best
Always behind you, always in your shadow, my happy place.

Perhaps I had written my destiny early on when at 5, I took upon myself to be your teacher.
Alone in the tea estate we were each other’s constant companion – no friends or neighbours.
A strict teacher - I insisted on you having your notebook and pen. You complied.
I taught you “Que Sera Sera” and you taught me “Momo Chittey Nito Nittey”.
With your carefree rendition you instilled in me the desire to dance with abandon.
Didibhai and I blasted out “Que Sera Sera” in the back seat of our car,
“Whatever will be will be…the futures not ours to see…what will be will be”
On our way to Phuentsholing with the wind from the triangular window slightly ajar,
Bathing us in the crisp fresh Dooars jungle air in our solid and sturdy Ambassador.
No luxury of a car stereo but we sang in unison and were ever ready with our playlist
Of all the songs Ms. Won taught us in school - they were such simple days.

I recall the little me protested every time you masked a smile and called me “paka”.
Why couldn’t I be anything but paka? Paka was precocious.
Not something I aspired to be. All I wanted to be was little. I would huff and puff.
And much to my consternation all the Mami’s caught on to my angst
And always asked you if I was becoming more paka. 5 mamis were too much.
I would throw a woeful fit while they laughed, teasing me gleefully.
So many nicknames you called me by, at each stage of my life - will never be heard.
Now that you’re at rest and you have ample time to browse through our memories,
I hope you remember those days over four and a half decades ago.
And smile at those benign moments. They were simpler and easier to bear.

When life was about Dida and Dadu, trips to Jalpaiguri for Bhaiphonta and Pujo.
Where we were welcomed by Dida and Mamis and life felt like a jamboree.
When breakfast rolled into lunch and lunch into tea and then eventually dinner
Because the quite large dining table wasn’t big enough to accommodate all.
As the chatter over meals was unending and you let your hair down contentedly,
Us kids brought the roof down leaping like “kumirs” and seeking some “danga”.
We’d return home with huge tins of moa and jars of Kuler achar, and abundance.
In Dida you all had the gentlest guide and her quiet fortitude embraced us all.
Back home bedtime stories were about Jalpaiguri, your siblings and school friends -
Annapurna Mashi, Jaya Mashi and Lily Mashi. Your forever friends.
They called till the end until they could take it no longer. Wilted in sorrow.

Between the occasional trips to the hustle and bustle of Jalpaiguri
And the quiet sequestered everyday life in the tea estate,
We kept absorbing all your habits, quirks and traditions.
Oblivious that it was shaping our identity. Ma, you peep in often.
During the daily Sada jeera phoron or Kalo jeera phoron, ongoing debate in my mind,
The potatoes and the acceptable slicing or dicing depending on the dish,
The Gods on my altar that I pray to and the rituals I watched and imbibed from you.
Your OCDs successfully inherited have for some reason accentuated lately.
There's hardly a moment in my day when you don't govern my actions.
Yet now somehow the same questions and clarifications choke my throat
And smother my heart when I realize the answers are voiceless - silent.
The answers had been repeated hundreds of times over. Both gently and sternly.
And repeatedly. How I wish I had heeded well.

I hope you don't remember our tearful partings at our boarding school.
Now that I'm a mother, I know it pained you much more than it pained us.
Boarding school was a whole different world, bereft of your snug kol.
Yes, we did cry now and then, but mostly we were in good company there.
We managed the daily humdrum of life with our new found friends.
The letters you wrote to me from home; so regularly, still waft before my eyes.
You visited us now and then and replenished us with chocolate cake and love.
I'm glad that I could convey to you how much I appreciated all that you did.
But it never seems enough. So, I continue to thank you in my heart every day.
I know it wasn't easy for you. It crumpled your heart each time you saw us off.
I remember the first time you dropped me off at the hostel I clung to your Aanchal.
I screamed; I shrieked but you had promised Baba not to shed a tear.
I now understand your sacrifice - the biggest of which was to let go of us.
To release the tight grip of my little fingers from your Aanchal.
That bound us together so that we could spread our wings.

Rest well...

Magic In Monotony

Shoubhik Pal

As we grow older, we often find ourselves in loops.

Where all days feel like one day, and before we know it, that same day extends into weeks, months, years, decades. We wake up, go to work, come back with physical and mental fatigue, find ourselves incapable of truly connecting with our friends and family. And so, we compensate for that through weekend movie plans, get-togethers with other families, long summer vacations in a revolving door of faraway places... only to come back to that day, that very same day.

If we're not careful, that day can box us in - into our square homes, the cars we drive to work, the cubicles we work all day out of. And then, after a while, we can start to feel imprisoned, incapable of truly breaking out of the minutiae, the monotony.

Even though I'm yet to start a family of my own, and some of the above use cases may not apply to me, I felt it. I felt boxed in - spending 3+ hours in the infamous Bengaluru traffic, driving to and from work. Being enveloped in so much work that I forgot to have a social life and started using corporate jargon like 'use cases' in normal conversations.

So, when the opportunity of a new job from a friend of a friend came, 100% remote with the flexibility to work simultaneously on some of my personal projects, I pounced.

The first thing I did once I was officially on board was finally give in to my friend Liz's pleas to come to Goa - where she was staying for the last few years - for a prolonged period of time. I instantly fell in love with one of the studio apartments out of all of the AirBnB options she shared. After

booking it (and being short of a few tens of thousands ₹₹₹s), I was officially ready to embark on what the kids these days were calling my first 'staycation'. Or wait, was it 'workation'? Don't know, kids these days use all kinds of strange terms.

After driving down there and assimilating for about a week, every single day began to congeal, to compound, into one - but, this time, in a good way.

The mornings were the most majestic. Rid from the fatigue of driving multiple hours in a day, my body clock made me automatically wake up anytime between '6-7' every morning - apparently, another strange term kids use these days. After taking a quick shower to officially get awake, I drove down to Morjim beach, a world-famous nesting area for olive ridley sea turtles. On the 20-minute drive there, three iconic vistas always welcomed me, views I don't think I could ever get tired of. The first, passing through the Siolim-Morjim bridge, with endless expanses of sea both to the left and right of me. Second, just as I was entering the beach's parking area, where, this time, the endless expanse of sea was just to the left of me, and a seemingly endless row of restaurants, bars and hotels to my right. Third, and finally, the edge of Morjim beach, where I sat down in the same spot every morning to write, this time no left or right, but rather, a near 360-degree view.

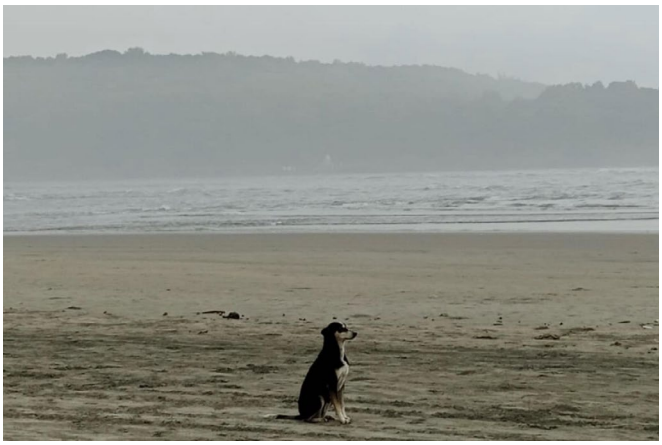
I'm not going to lie to you, I used to hate going to the beach. I was firmly on the mountain side of the 'mountains vs. beaches' debate. The times I usually went to the beach before this were in the afternoons or early evenings, when the Sun was still blaring and sweat started pouring out of my every pore within ten minutes or so of being there.

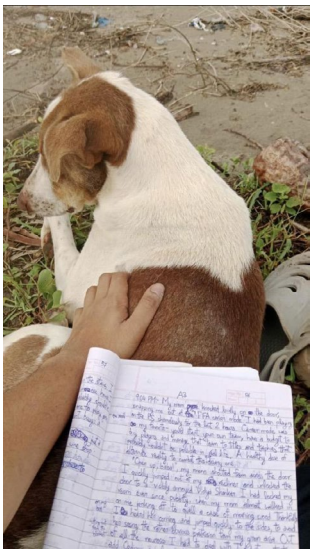
The beach in the mornings though, especially in the monsoons, was a thing of beauty. The cool breeze, the lack of crowds, the clouds above mixing with the mist below, so much so that if you looked far out enough into the never-ending sea, you couldn't tell which was which. For a while, a concentrated period of time, it felt like I was the only person in the world.

Soon enough, the setting became populated by a regular cast of characters. First, a set of 4-5 beach dogs that always seemed to gravitate towards me within 15 minutes of me sitting there. No magic or serendipity involved, just a pack of biscuits that I used to carry with me. No, the magic was, after I fed them, they'd continue to stay around while I was writing or ideating, occasionally posing for the rare times I decided to take photos of them:

More characters soon came into the picture. A middle-aged British guy, who used to bring his three dogs with him for his walk - an ultra small one, a medium-sized one and a larger-than-life one, resembling the evolutions of a Pokémon. A group of kids playing football, kicking the ball towards one another as they ran laps around the beach. A girl around my age, her mother and her dog, coming to the beach together and then diverging - she and her dog going to the left, her mother to the right - yet, somehow, an hour later, converging at the same spot at the same time and going back home together.

The second the Sun made its unwanted appearance, that was my queue to leave, the beach dogs following me to my car, where I left another pack of biscuits that I fed to them before leaving them for good that day.





Some days on the way back, I stopped at the local fish market right by the river to pick up prawns. I almost always stopped at this small cafe to pick up breakfast - the same order everyday, scrambled eggs with cheese and a type of local Goan bread called poiee on the side.

I often entered this cafe with the 20-something year old Bihari cook, the only one operating the cafe in the mornings, passed out on one of the couches. Goa was a laid-back place where people usually woke up in the afternoons, meaning they didn't get many orders in the AM. When I woke her up with a few taps on her shoulder with my phone, she'd always scream out, 'Kya bey!', only to come to her senses when she realised it was a customer. Without saying anything, because she instinctively knew my order, she began preparing the eggs, and once she had sufficiently woken up, began doing chappad chappad, saying all kinds of random things, to which I responded with a 'Hmm' or a 'Sahi' or occasionally a 'Very good'. After she was done, I took the breakfast to my apartment and enjoyed it amidst the calm music coming from my speakers and the coconut trees flanking my verandah.

Of course, while so far this sounds like a total vacation, it wasn't and I had work to do. So before I got ready and went to the cafe I used to work out of for the day, I'd shoot a WhatsApp message to my cook-cum-cleaner with items to make for the day, usually involving prawn curry.

This was a unique relationship in itself. She was also a

20-something, the daughter of the elderly help who used to handle multiple homes in the apartment complex and didn't have time to fit me into her schedule, suggesting her daughter instead. My mother warned me to limit interactions with her, she had heard multiple stories about young helps who cry wolf. I listened to her, but took it to another level - during my one month there, I never met her once. I'd WhatsApp her with what to cook and clean in the mornings, leave the keys with security, she'd pick them up, cook & clean, periodically mess up the YouTube recommendations on my Smart TV by watching endless episodes of Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma, then leave the keys with security before I got back at around 3:30-4. A relationship truly fit for today's digital-first era.

Once I got to the cafe I worked out of, another unique equation, this time with the cashier-cum-manager Kim. Here too, I ordered the same thing daily - an iced pour over coffee in a to-go cup.

Kim knew that, and would mess with me regularly about it. 'Oh I forgot your order, cappuccino, right?' or 'I'm going to make it my life goal to make you try something else on the menu.' I played along. The day after she took a leave, 'Oh, you missed it, Kim, I ordered something else yesterday and you weren't there. Sad.'

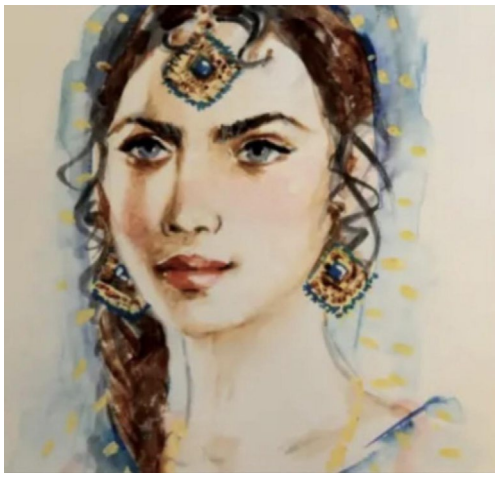
We'd do this banter for around 3 minutes daily, which amounted to 3*30 days = 90 minutes of total interaction during my time there. Yet, strangely, by the end of it, we had a rapport similar to one life-long friends shared. We even hugged goodbye on my last day.

Once I got back home, after eating a very late lunch and subsequently taking a power nap, the evening presented itself in distinct binaries.

The first, especially on the weekends, I'd go to the nightclub where Liz worked to hang out with her and her friends. Seeing as I often drank there, and I make it a point to not drive drunk, I called upon the help of what the locals called 'pilots' - a bike taxi driven by a 50-something named Vilas. On the bike ride there, he'd tell me about places I should visit, his problems with diabetes and sometimes, local news - usually depressing and involving drunk drivers running over cows and, sometimes, people. He'd drop me off there, I'd give him the time to come back and pick me up, he'd reach 15 minutes before that assigned time, like clockwork.

The second binary, the one I often preferred, was staying in my flat in the evening, either writing by the pool downstairs or working out of my room. I was alone, but it never felt like I was, because my room was populated with paintings of different, striking women, all made by my AirBnB host who was a renowned painter. She was the most striking:

Very early on, her eyes did this thing where they followed me around the room, and her expression made me imagine her dishing out snarky comments to whatever I was doing. When I woke up, 'Oh! A little late, isn't it?' When I did yoga in



the evenings, 'Is that all you got, "young" man?' When I came out of the bathroom, 'Ew, what did you even eat last night?'

That was essentially how that one day was, the same day that went on & on for one whole month. It made me very sad that I had to leave, because I could totally imagine myself living this day for the rest of my days. What was even sadder was, when I came back a few months later, staying in the same apartment for the same period of time, trying to replicate the experience, nothing was the same. I ended up going to the beach only about 4-5 times that month, unable to wake up most days before the Sun unceremoniously made its presence. The cafe where I got my breakfast from changed locations, somewhere very far away, and the cafe where I worked out of shut down their workspace. Out of familiarity, the girl in the painting on the wall stopped quipping and commenting on all my actions.

I guess the moral of the story is, we have fleeting opportunities to add a dash of magic to the potentially monotonous days we inhabit. I'd imagine that anyone who is reading this (and if you've read up till this point, thanks for reading) doesn't have the capacity to leave their daily lives and gallivant around the world like a vagabond all year long, living every passing day trying to make it vastly different than the previous one. No, we must make do with the fact that, this one day we all live has millions of permutations and combinations to potentially make it a memorable one. So, if you're driving back home and you pass by a stunning view of the Sun setting, stop for 5 minutes and take it in. Pursue that passion you've always wanted to pursue, go to those places in your city you've always wanted to go to, strike a conversation with strangers you see regularly who you've so far kept at arm's length.

Once you actively endeavour to add something new to that same old day, that's when you'll find true magic in monotony.

Kolkata and India's Love for Football

Arnab Karmokar

I was in the back of a car in Kolkata in August when I came across a 9-foot-tall cutout of Cristiano Ronaldo in his Portugal kit, staring straight at me, with the caption "The Last Dance" written in bold block letters. I remember being genuinely shocked that a tribute this size existed, in an Indian city, for a player who has never played a single match here. The more I roamed around, the more football hoardings I came across: large cutouts of Neymar Junior, billboard ads with Lionel Messi's face on them, and an entire street market strung with Argentine blue and white flags, to the point where for a second I genuinely forgot I was in India. It truly is fascinating that a country whose men's football team is ranked in the 130s, that has never played at a World Cup, that most of the sporting world would struggle to name a single current player from, is also one of the most football-obsessed countries on earth.

For many years, India's football love has pointed outward, toward other countries' teams and other countries' stars, but history tells us it did not start that way. In 1911, Mohun Bagan, a Kolkata-based football club and one of the oldest in Asia, won the IFA Shield playing barefoot against a fully-booted British Army regiment, still remembered today as the day Indians beat the English at their own game. India qualified for the 1950 World Cup in Brazil after other Asian teams withdrew, though they dropped out due to travel costs before it started. They reached the semifinals of the 1956 Olympics and won gold at the 1962 Asian Games.

There was a real version of the Indian football team that was good at this sport. But it stopped improving through the 1960s and 1970s while the rest of the world professionalized. Pelé played an exhibition match for the New York Cosmos against Mohun Bagan at Salt Lake Stadium in 1977. Then came the 1986 World Cup, where Diego Maradona, a young genius, carried Argentina to the title and gave Kolkata something its own team had not given it in years.

Before long, Indian football fans had become deeply attached to Brazil and Argentina, and Messi inherited Argentina's share of it. He captained the team at Salt Lake Stadium in 2011, in a friendly against Venezuela. But nothing matched December 2025, when he returned with Uruguay's Luis Suárez (his old FC Barcelona teammate) and Argentina teammate Rodrigo de Paul as part of his "GOAT" tour, and Kolkata got him first. Fans did not even wait for him to land before building him a monument: in just forty days, they put up a seventy-foot iron statue of him holding the World Cup. By the time he actually arrived, fans were so desperate for even a glimpse of him that the crowd's excitement spilled over during the tour.

This is essentially one of the biggest problems with Indian football: none of that devotion has ever really made its way back to the team actually representing the country. No one has carried the weight of that gap more visibly than Sunil Chhetri. He is India's most-capped player and its all-time leading scorer, and at one point ranked fourth on the all-time list of international goalscorers, from any country. In 2018, ahead of his hundredth cap for India, he posted a video calling out everyone who poured their passion into European clubs while ignoring the national team, urging them to come to the stadium instead, even if it meant booing him. It went viral overnight, and even Virat Kohli, cricket's biggest star, publicly backed him. The next match ended up selling out. Six years later, Chhetri played his farewell at Salt Lake Stadium in front of nearly sixty thousand people, on his lap of honor. He came out of retirement a year after that, at forty, because no one else was ready to take his place.

Even with the unsuccessful run Indian football has had recently, something has actually started to change. Ranjit Bajaj has spent almost two decades building Minerva Academy, a youth football academy he founded in Mohali, Punjab, in 2005, funded largely out of his own pocket. Earlier this year, a Minerva under-15 side he had personally financed, at real risk to himself, beat Liverpool's youth academy 6-0 in Spain. A few months later they won the Helsinki Cup, the first Indian side ever to do it, scoring 295 goals along the way. For once, the thing everyone agrees Indian football is missing has a track record and real momentum behind it.

And now, even the senior team is getting a moment of its own. On October 3rd this year, Brazil's senior men's team will play their first-ever match on Indian soil, taking on India at Salt Lake Stadium as the highest-ranked opponent India has faced since FIFA rankings began in 1992. The Brazilian Football Confederation framed it less as a courtesy stop and more as a thank-you for just how devoted India's fanbase has been for decades. It is a huge deal for football fans in Kolkata and across India who have spent decades loving Brazil from a distance, and something more than that too: a stadium full of people who came to watch Brazil will, for once, be watching India too. A chance for some of that love to finally come home. I hope some fan in that crowd, there to see Brazil, looks over for just a second and actually notices who is wearing the Indian blue kit.

Importance of Love: from Human love to Divine Love

Swami Divyanathananda.

Love is a mighty force.
Where there is love, there is no fear.
Love dispels all kinds of fear, said Christ. Pure, selfless love is a divine force.
"Of the three- virtues, faith, hope and love, love is the greatest" said St. Paul.

Love is that great propelling power which binds families together. When this love expands from family to nation, it becomes much broader. In India, during the freedom struggle from the British, so many young men gave up their life for the cause of freedom of their country. All these were rooted in love for country. About the Japanese people Swami Vivekananda said, "The faith of the Japanese in themselves, and the love for their country..... The Japanese are ready to sacrifice everything for their country and they have become a great people.". Love is an important ingredient which keeps our life moving. Yet... It is not easy to love, and Real love is rare.

The word 'Love' is so commonly used in our daily life, however, all are not fortunate enough to receive parental love from their childhood. For want of parental love in childhood, many children turn into criminals when they grow up. Again, by showing love, sympathy, and compassion, one can change others. Let me narrate a story.

A professor of psychology sent a team of researchers to a certain slum area in Baltimore, America and made a survey about the young people therein. They interviewed some 200 children and came out with horrific reports. According to that report, most of the children would invariably turn into criminals when they grow up. Exactly twenty years later, the same professor sent another team to the same place and they could identify 180 of those 200 children, again interviewed them and found to their astonishment that the predictions of the earlier research have proved to be wrong. Most of the adults who were children during that time, and about whom the prediction was made, have turned up into responsible citizens. Then they went to find out, what was the cause. They found that a teacher, called Sheela O'Roorke had taken care of all these 200 young children. She took personal care of each of them, listened to their problems, found out the strengths of each and helped to give a shape to their life. Her method of teaching was by love. But if necessary, she used the cane too, to punish any unruly child. Slowly, all those children came under the orbit of her love, which moulded their life. Had they not received her love, they would have turned into criminals.

Love binds a family and for want of love, families often get disintegrated. Here is an example of two different families.

There is one family, comprising of the husband and wife, with their two children. They are quite rich and affluent, living in a palatial building in a cosmopolitan city. The husband gets up early, then tries to wake up his wife for a cup of tea, but she continues to sleep. The man makes the tea for himself, cursing his fate. He tries to wake up the children, but in vain. They grumble for having deprived of their sleep. They start for school, which they don't like. They blame the monotonous routine every day. They blame their mother for the blunt breakfast, while their mother blames her husband for not giving attention to the household. The father actually runs a big business, is very nice to his customers, but rude to his wife and children. The children on the other hand cannot open up themselves to their parents. So, in one way, everybody in the house is unhappy with something or the other. Outwardly, they have all the amenities of life, but the one most important ingredient, LOVE is missing from their life.

There is, on the other hand, another family, which is quite poor. They have to work very hard for maintaining their living. They have a simple house, but they keep it clean. All wake up early in the morning. While the wife cook food for the family, her husband also lends a helping hand to her. The children prepare their lessons and cleans the courtyard of the house. They are sincere in their studies and hard-working. In the evening they all seat together and share what happened during the whole day. In this family, a strong love is binding each of them and that is why, the family runs so smoothly. Thus, love is the life-blood of family life.

In the beginning, Love is confined to our body, our house and family, our profession and the small circle of near and dear ones around us. But it is possible to extend this love further and further. The greatest manifestation of love is seen in Holy Men, who have expanded their heart to include the entire humanity. Their love doesn't have boundaries of race, language and country. In the modern times, we have seen the extraordinary life of Sri Ramakrishna, Holy Mother Sarada Devi and Swami Vivekenanda. We shall give a few illustrations from their life.

Somebody asked Swami Vijnananandaji, what attracted him towards Sri Ramakrishna. Sw. Vijnananandaji immediately replied, at that time he had no idea about Sri Ramakrishna's spiritual greatness, renunciation, absorption in God, etc. What drew him towards the Master was his unalloyed love. His love was so deep that even he didn't get that much love from his parents, brothers, or friends. Many other disciples

of the Master were of the same opinion. Swami Vivekananda used to say about Sri Ramakrishna- He was L O V E personified.

Holy Mother, Sri Sarada Devi during her childhood would lend her helping hands to her parents in the household chores. When the great famine in Bengal broke out, her father, though a poor brahmin decided to distribute cooked food to the poor persons of the locality. As the cooked food was being served in the plates, the young Sarada, with her tiny hands would fan it, so that the warm food cools a little and the person can partake of it. As a wife she took care of her ailing husband and looked after the devotees who would come from far and near. In her parental home, when she lived there with her brothers, she would day and night serve the family. Sometimes devotee families would arrive suddenly without prior information, however, without showing slightest sign of annoyance, she would accept them lovingly, make room for their lodging, cook food and serve them in their own hands. They also very easily would feel at home. Some devotee would come to her with great eagerness for initiation, she would gladly initiate them, even during sickness. She had the power to take sins of others and gladly suffer for others' sake. Those who would complain, saying they were unable to undertake japa every day, she would say, 'I shall take your responsibility, You need not do anything'. Actually, she was seen making japa for others, knowing that many of her disciples after taking initiation were careless about daily meditation. During extreme hot season in Kolkata, she would cover her body with a cloth and accept pranams from the devotees for hours together. Holy Mother Sri Sarada Devi was the very embodiment of Love. To Her, the whole world was her own. No one was a stranger. Her love was truly universal. Devotee, non-devotee, good children as well as fallen ones, persons of low caste, poor, uneducated and birds and animals received Her unbounded love. Her love was not only confined to the welfare of Her children in this life alone, but to the other world also. Swami Abhedanandaji, in Her famous hymn to Sarada Devi wrote:

स्नेहेन बध्नासि मनोऽस्मदीयं
दोषानशेषान् सगुणीकरोषि ।
अहेतुना नो दयसे सदोषान्
स्वाङ्के गृहीत्वा यदिदं विचित्रम् ॥९॥

You tie our minds with the tenderness of maternal love, and orient our lives which are filled with endless faults into good qualities. Without any motive you take pity on us who are filled with various faults. And, accepting us as we are, take us on your lap, this indeed is surprising.

Swami Vivekananda, although he was an all-renouncing monk, yet he had the heart of a loving mother. The day when made his world-shaking speech at the Parliament of religions at Chicago, was he feeling himself at the top of the world, looking back at his success? No, on the contrary he was so much worrying for his poor motherland that he couldn't sleep the whole night. The degraded condition of his countrymen couldn't make him sleep in the luxury of the hotel room, instead he was weeping, thinking of their deplorable condition, many of whom couldn't afford square meals a day.

When Bengal was hit by plague, he was ready to sell the lands of Belur Math. In those days, it was unthinkable to get large donations to meet the cost of relief work.

Another incident is worth narrating. At that time Swamiji was staying at Belur Math and Swami Vijnanananandaji, although most of the time he would stay at Allahabad, he also happened to be there. One night, Vijnanananandaji woke up in the middle of the night and as he stepped outside his room, he saw Swamiji pacing up and down in the Veranda. VIjnanananandaji asked him, why he was still awake, Swamiji replied, 'I was asleep, suddenly I woke up, as if shaken by something and felt, someplace might have been hit by a calamity and several people were crying in pain.' Vijnanananandaji couldn't understand what Swamiji meant. However, the next morning the newspapers reported of a huge fire in a nearby island of Fiji and several persons had lost their lives.

Just as love is so powerful, the opposite of love, which are hatred and jealousy are forces which make us weak. Love binds; jealousy separates. Love lifts a man from darkness; hatred degrades us into the depths of hell. Most of the violence that we see in our society is borne out of hatred and jealousy. Out of the six enemies of men, Hatred and jealousy are considered as one's enemy. They are inter-related to each other. Hatred burns the person himself as well as the other. A man who is hateful of others always feels irritated and bitter. He will not spare any opportunity to cause harm to the person whom he hates. We shall cite two illustrations:

A teacher in a certain school earned lot of love and respect from his students because of his loving nature. He also showed his due respects to the headmaster. However, the headmaster couldn't digest the popularity that the teacher earned from his students and so, felt irritated in his presence. For years together the headmaster never talked to him with love and respect. The more his popularity increased, the more he felt jealous of the teacher. After some years the headmaster was able to transfer the teacher to another school. Because of hatred and jealousy, he failed to see the good virtues in the schoolteacher.

A middle-aged woman, suffering from sleeplessness, anxiety, and extreme fatigue consulted a doctor for treatment. She also confessed to the Doctor that at times she was contemplating of suicide. The doctor, who at first couldn't identify the cause behind her problems. However, by repeated visits and questioning, the doctor found that actually she was feeling extremely jealous with her own sister because of some personal family issue.

During this time a holy man, who happened to visit the house of the lady offered her a remedy. He said, you surrender to God and pray to Him sincerely to relieve you of this aversion to your sister. The lady followed the advice of the Holy man and by sincere prayer could get out of the darkness

which was killing her from inside.

In other words, there is remedy for getting over these two enemies. If we practice unselfishness in our daily acts, along with prayer and meditation, it is possible to lift our mind from feelings of hatred and jealousy.

The highest manifestation of love is love for God, or divine love. It is possible to expand this love which we have for ourselves and the small circle around us further and further. If we practice bhakti, then this love will expand. Since God resides in all beings, so by loving God, we actually will be able to love all beings equally. The Bhakti schools have laid down nine modes of approaching God, called Navadha Bhakti. We can approach God as our Father, or Mother or friend, or as spouse or even as a child. So, if we are able to develop a personal relationship with God, it will be easy to connect to Him. We find this in the life of Sri Ramakrishna. He received the vision of the blissful divine Mother only by yearning. The shepherd boys of Vrindaban approached Sri Krishna as their friend and so was Arjuna. Yashoda looked upon him as her own child. The Gopis loved him as their beloved. In today's age, Aghormani Devi, one of the devotees of Sri Ramakrishna, called as Gopal's mother has shown the great transformation that took place in her life by serving her chosen deity as a small child. She led a very austere life and spent long hours in japa and meditation. Her chosen deity was baby Gopala. There was no room for anything else in her life but serving Gopala in heart and spirit. Then one day the baby Gopala actually became a living being in her life. She could see him, running here and there, taking food offerings, sleeping by her bed-side. Her love for her chosen deity was so intense that The Lord couldn't contain himself, but actually come into Her life and bless her.

When a spiritual aspirant develops intense love for God, then God cannot contain himself. He answers the call of the devotee and bestows the vision of his divine, blissful form. At that point a great transformation takes place in the devotee. He loses all sense of 'I' and 'Mine'. The 'unripe I' merges into the 'Ripe I'. Love finds fulfilment in divine love. When the devote reaches that state, he will be able to love all equally without any prejudice.

That is real love. However, there are certain parameters to judge, whether the love is real or not. Swami Vivekananda has explained the conditions of real love in the following way: There are three angles in a triangle.

In the triangle of love, the first angle represents that true lover doesn't bargain. A true lover loves for its own sake. Wherever there is any bargaining real love cannot be there. Swami Vivekananda gave an illustration. A king once visited a sage in a jungle and was very much impressed by his renunciation, knowledge and devotion and so requested the sage to visit his palace for he wanted to give gifts to the sage. The sage at first refused, saying the resources of the forest were enough to meet his requirements. However, after much persuasion, the sage agreed, and accordingly after many days he visited the royal palace of the king. But as he entered the palace, he could hear the king praying to God, 'Oh Lord, give me more children, give me more wealth!' As he heard these, he started leaving the palace. At that time, the king saw him and cried out, 'Maharaj, please wait, let me finish my prayers and then I shall attend to you.' The sage replied, I cannot receive gifts from a beggar. You yourself is a beggar, begging of worldly things from God.' So saying, the sage left the kings palace.

The second angle represents love doesn't know any fear. Many pray to God from fear of punishment. They are called 'God fearing devotees' However, that is not real devotion. Swami Vivekananda gave an illustration. Imagine, a mother walking on the street and a few dogs barking and chasing after her. She will try to find some corner where she will hide herself. But the same woman, carrying her child on her lap, and suddenly confronted by a lion. In that position, she will not hesitate to go into the mouth of the lion to protect her little one. Fear has gone for love for the child. Thus, real love doesn't know any fear.

The third angle represents love does not know any rival. Everybody has his own ideal of love. While someone loves the highest thing, other may love the vilest of the things. It is in the eye of the lover that the ideal of love finds importance. To quote Swami Vivekananda, 'Everyone admits the truth of the saying that the lover sees Helen's beauty on an Ethiop's brow. The man who is standing aside as a looker-on sees that love is here misplaced, but the lover sees his Helen all the same, and soes not see the Ethiop at all. Helen or Ethiop, the objects of our love are really the centres round which our ideals become crystalised.....that ideal which men and women commonly worship is what is in themselves; every person projects his or her own ideal on the outside world and kneels before it.

A star named Arundhati/ Tarar Naam Arundhati

Piali Bose



We witnessed a spectacular curation on the life and works of Arundhati Devi, the erudite, beautiful actress, singer, dancer, director and producer who was so ahead of her times. Born on 29th April 1924 at Barishal, Bangladesh, to the famed Guhathakurta family, she carved her own distinct identity and reflected the rich cultural history of 20th century Bengal.

I recalled quite a number of her films we watched while growing up and the interesting background stories shared by our parents.Mrinalini Vasudevan and Tapati Guhathakurta (the curators of this remarkable archival exhibition), did share how this immensely painstaking work was collated in just about 5/6 month's time with very limited resources.

There was so much to know about this remarkable woman , her education in Shantiniketan, interaction with Tagore, her musical.joyrney under the tutelage of the famous Rabindra sangeet singer, Shailajaranjan Majumdar after which she started her singing career at All India Radio. Before starting her acting career , she was involved in Indian National freedom struggle and was quite close to Mahatma Gandhi.

Her filmography boasts both her acting and directing prowess. Her distinct choice of roles and selection of stories she turned into films made her such an unique feminist personality without having to overtly flaunt it. She chose to portray woman who suited her persona ,strong willed, dignified and yet never losing the feminine touch and maternal instincts.

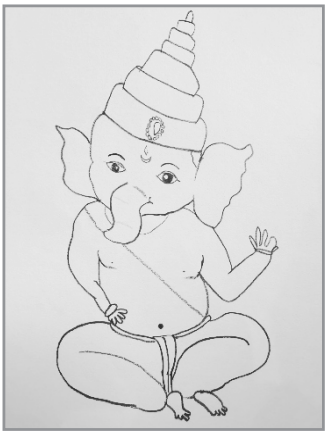
With her majestic demeanour and aristocratic appearance, she held her own and commanded respect by being herself. Her second marriage to ace director Tapan Sinha brought about many memorable films like Jatugriha and Jhinder Bandi, which Bengali goers still recall. Being part of elite delegation to Hollywood film studies with renowned actor, directors and filmmakers made her part of a distinguished brigade of moviemakers who represented India in the global forum.

Winning National awards for both her acting and directorial venture bears testimony to her contribution to Indian cinema.

Ganesha's Cake Shop

Ishaana Mandal, Grade 5, 11 years

Once upon a time there was a city named Pom. In Pom City there was a very popular cake shop named Ganesha's Cake Shop. People from all around the world used to come to this shop. Ganesha was a God who had a head like an elephant. Ganesha's business was going really well until, one night a thief broke into Ganesha's shop. Ganesha was asleep at that time. The thief stole all of Ganesha's cakes that night. The next morning when Ganesha woke up and stepped in the shop, he was in shock!



A few cakes were messy on the ground; the ice cream boxes were in a clutter. Poor Ganesha did not know what had happened in his store. BAM!!!! Poor Ganesha slipped on water and fell down. Like everyday people were standing in a queue and waiting for the shop to open. It slowly became a stress for Ganesha.

As Ganesha opened the store and said that the shop is closed today, all the people standing in the queue immediately went home angrily. Then, with Ganesha's magical powers he saw the past and understood every single thing the thief did, so he decided a plan to do on the thief. First, Ganesha took a book about thieves and found the thief he was looking for. The name of the thief was Jax. Jax is a crime master. Ganesha read about Jax and understood Jax's weak points and strong points. So, Ganesha made a spicy cake and wrote VIP on the cake and then kept it in the fridge. It was 9:00pm in the night, as expected, the thief was again there but this time God Ganesha was also there. As the thief took the cake out from the fridge and took a big bite, "AHHHHHHH!!!!" shouted the thief. Ganesha immediately called the cops. The cops arrived right away in 5 minutes and arrested the thief. Ganesha was so happy as he saw the thief going to jail.

From that day on Ganesha always locked the door when he was not inside the shop. Ganesha was happy again as his business started continuing again.

Abraham Lincoln In My Eyes

Soham Kundu, Grade 8, 14 years

When I think of Abraham Lincoln, I think about a leader who stayed determined even during the most difficult times in American history. He served as the 16th president of the United States of America during the devastating Civil War that divided the country, but yet, he continued to work toward keeping the nation united. To me, that shows great courage and responsibility.

One of the things I respect most about Abraham Lincoln is his belief that everyone should be treated with dignity. Although ending slavery was a complicated process that happened over a long period of time, his leadership made him an important figure in the removal of slavery. He believed that the country could become a better place by expanding freedom and giving hope for a more equal future.

I also admire Lincoln because he never gave up despite facing multiple hardships. Before becoming the president of the United States of America, he had multiple business failures, election defeats for the senate, and lost his father at a very young age. However, despite all of that, he learned from his struggles and continued working towards his goals. This instills in me the mindset that success comes from determination, not just talent.

Another reason why I admire Abraham Lincoln is because of his speeches. His speeches were short, but very powerful. They encouraged people to remember the sacrifices made during the Civil War and inspired them to continue working for a united country.

One incident which shows why I respect Lincoln was his response after the Battle of Gettysburg. Many soldiers had passed away in one of the deadliest battles of the American Civil War. But, instead of just focusing on the tragedy, Lincoln gave a speech that reminded why the war was being fought and encouraged them to work towards a united country. Even though the speech was short, its message about freedom and equality inspired people back then and continues to inspire people today. This incident makes it evident that true leaders can give people hope even during the darkest, most unprecedented times.

In my eyes, Abraham Lincoln was more than just a president. He was a symbol for determination, leadership, and hope. While no historical figure is perfect, I believe his dedication for uniting America and expanding freedom in the country made him one.

懇談会

ロイ　れい子

「こんばんは。ご紹介いただきました木村です。」そして先生は鏡の自分に礼をしました。「この頃、お辞儀をするのが大変億劫になりました。なぜかというと、頭を下げると頭の上に光が反射するようになってきたからです」。残念なことにこれは本当なのです。

先生は続けました、「だけれども30年以上前にこの大学で教え始めた時に頭に髪がびっしり生えていたのでした。」本当にそうなのでした。溜息が出ました。

「ずっと学生と向き合っていて、時には戦っている内にこうなってしまいました。」

「振り返ると最初の何年かは大変でした。」大学出立ての木村先生は他の大学で教え始めました。木村先生には教室いっぱいの生徒の前に立つのとジャングルでライオンに向き合っているのとの違いが分かりませんでした。だんだんと先生自身が大学生活に馴染んできて、学生が敵ではなく友に見えてきました。時には幼くてかわいいという感じもしました。大学に入りたての社会学部の学生でも実際にまだ社会のことはあまり分かっていないということに気が付きました。場合によっては、親元、地元を離れて暮らす学生が辛そうにも見えました。

上から目線ではなく、学生のことをある程度分かってから授業に取り組みたいと、木村先生は一学期の最初に簡単なアンケートをすることにしました。簡単に言えば授業でどんなものがしたいのか、何か困ることがあるのか、新しい発見や学びなどがあるのかまで聞きました。そこで思い出に残る答えがたくさん返ってきました。いくつかは未だに忘れられません。その中から木村先生はいくつかを紹介し始めました。例えば、静かな田舎から来た学生が東京の人混みに大変驚く、初めてホームレスを見て怖くなるとか。沖縄からの学生が電車をとても魅力的に感じる、しかし人が大勢いて道を渡れなくて慌てる、その内にただ前の人について歩くのだと、解決する。北海道から来た学生が初めてゴキブリを見て仰天する、そして東京の学生が長い通学にうんざりして、混雑した電車の中で立って寝る技を身に着ける等々。「もっとたくさんありますが、時間の関係で今はこれ以上話せません。」木村先生のスピーチは最後の方に近づいています。

「ここでお伝えしておきたいのは、頭の髪の毛は少なくなったけれども、その代わりによい思い出がたくさん増えたということです。それで胸の中がいっぱいになりました。」

誰もいない広いお手洗いの中で木村先生の潜めた声でも何倍にも大きくなって響き渡りました。下っ端の先生の平凡な仕事と、生活のありふれた思い出話が自分の耳に入ると、急に感情が高ぶってしまいました。そして目から大粒の真珠がぽろぽろと落ちて来ました。どうもご清聴ありがとうございました。

大学の懇談会が始まろうとしています。木村先生は少し緊張気味で受付の前に立ちました。受付にいる事務員さんの一人が先生の方を見て挨拶してから、事前に準備してあった名簿の、木村先生の名前のところにチェックをつけました。

「先生今日は主賓ですね。」と声をかけました。

「ええ、いいえ、いいえ、そんな感じですかね。」と先生はおどおど。

木村先生は会場に入りました。大学の、最近建てられた一番新しくて一番高い建物の一番上の17階です。会場の、通常壁と窓があるところのすべてが窓という感じです。というのも三面のすべてがガラス張り、天井から床までです。周りにそこまで高い建物がないので、入った瞬間、周りは全て空です！宇宙に立っているような感じがして木村先生は急に動悸がしました。さすがのスカイコート！名前の通りです。長い間勤めていてもここに来るのは初めてでした。何年か前に建てられたけれど、宴会などに呼ばれるような立場ではないので来る機会はありませんでした。自分から進んで見に行こうともしませんでした。定年直前になって、初めて学部の宴会に招待されました。最初で最後です。最初で最後のスピーチも頼まれました。

この大宴会場に足を踏み入れたら木村先生はもっとびくびくしてしまいました。高級そうなスーツを着た自分の年の半分ぐらいの若い人たちが慌ただしく動いています。事務の人たちでしょうか。顔見知りの人は誰も見当たりません。知らない人の群れから誰かが「先生、こちらにどうぞ」と手振りで壁際の椅子を指しました。「ああ、はい」と言って木村先生はそちらまで行ってから、一人でじっと座っていれば緊張感が高まるだろうと思ったのでしょうか、椅子には座らず、手提げカバンを置きました。色あせて、本物の革の外側のあちこち剥がれてきて古臭くなっているけれど使う分には問題ありません。長年の友、どこか自分に似ているような感じで、木村先生はそれを捨てきれず今まで使い続けています。これから先生もカバンも仕事がなくて同じような運命なのかもしれません。

プログラムが始まるまでまだ時間があります。カバンを置いてから先生は外に出て隣にあった御手洗に入りました。使う必要はありませんでした。ただ一人になりたかったのです。広くて、きれいで、誰もいない静かな場所で少し落ち着きました。あたりを見まわし、手持ち無沙汰で木村先生は今日のスピーチを練習し始めました。書いたものを持ってはいますが、本番で読むつもりはありません。今まで学生に言い聞かせて来た、「スピーチは読むのではなく、演説するものだ」と言うことを信じているからです。

スピーチと言っても難しいアカデミックなものではなく、木村先生自身の教える経験をもとにして書かれたものです。ピシッと立って、外に音漏れしないようにある程度低い声で先生は演説をし始めました。

美しき民族衣装

しずくまゆみ



世界各地に住む様々な民族には、文化に根付いたそれぞれの民族衣装があります。
日本なら着物です。
「着物」と一言で言っても細かく見れば、いろいろあると思います。
私は日本に生まれ育った生粋の日本人ですが、実は「着物」の知識は…。
お恥ずかしいながら、あまりありません。
それでも「着物」いわゆる和装には、いろいろあるなぁと思っています。
私が知っているだけでも、浴衣。打掛。袴。振袖。訪問着。お坊さんの着物に神主さんの着物。白装束と本当に様々あります。

インドにも民族衣装はありますね。
女性が着るサリー。男性のターバンぐらいしか私は知らないのですが…。
でも日本の着物と同じでいろいろあるのだと思います。
ある時、インドの民族衣装で目を見張って驚いたことがあります。
それは隣人のお嬢さんがインドの舞踊をお披露目してくれた時のこと。
パンツスタイルだと思うのですが、その衣装の美しさは本当に素晴らしかったです。
舞踊衣装は、彼女の繊細なダンスをとても引き立てていました。
ダンスはインドの古典舞踊もあり、踊りに併せて衣装も変わるので、その度に目は釘付け状態でした。
インドの美しい文化、素敵でした。







私、後期高齢者

長田　雅子子

七月に七十六才になった。もう堂々の後期高齢者だ。嫌な響きのあるこの呼び名に抵抗を感じていたが、今ではそれに順応しようと考えるようになった。八十才は間近だ。これからは一日一日を大切に、そして健康により気をつけながら、自分らしく生きなければと考える。そんな私は一月に肩を痛め、仕事をやめた。リハビリに通いながら、再就職をしたいとも思ったが、八十才までの限られた時間は、仕事のために失うよりは自分のために大切に使いたいと考え、仕事への思いは封印した。全日空（ぜんじつあき）に慣れない私は、オールフリーの生活に大きなジレンマを感じ始めた。テレビで美味しいトマトがあると聞くと車に飛び乗り、三時間近くをかけてそれを買いに行った。その牧野ハニーは美味しかったが、どことなく不満が残る。なぜだか分からないが、精神的に満たされないのだ。



七月のある日、私は藤田嗣治、ピカソ、ゴッホの絵を見るために東京へ行った。時間に余裕ができたので、たまたま開催されていたアンドリュー・ワイエスの絵画展に立ち寄った。私はその画家のことを何も知らなかった。アメリカ人の画家らしい。彼の作品を見始めると、私は何か不思議な気持ちになった。色彩美や派出な技法はない。どちらかと言うと地味である。でも、そこには風があり、土の香りがして、生活を感じるのだ。描かれている世界は、私が感じてきたアメリカの風土ではない。だが、ひかれるものがある。私は驚きと絶えまない関心に導かれながら絵の中を旅した。そこは光と影が織りなす世界だった。



私は写真を撮ることが好きだ。風景と共に屋根や柱、壁等の被写体に惹かれて撮ることもある。彼の絵には鄙びた建物や窓や壁等がある。その中に描かれている人物は、無味乾燥で、人ではあるが、絵の中のアクセントのように感じた。まるであたりまえに存在する空気のようだ。彼の作品には、写真を見ているようなリアリズムがある。私は絵の構図を見ていた。絵のどまん中に大きなケースがある。その絵を見ていると、主人公にはなり得ないものの存在に違和感を感じた。なぜこんなものを中心にもってきたのだろう。私はカメラのファインダーを覗いている気分になっていた。不思議である。こんな構図もあるのか。納得を感じる自分だった。また彼は作品にフィルターをかけたのかなとも感じる。彼が描いている世界はもっと明るいものだと思うのだ。だが彼は、そのものずばりを表現せず、まるで白黒写真を描き、光と影の力によって作品に深い味わいを与えているように感じる。初めて出会ったワイエスの世界が、心のすき間を埋めてくれたような喜びを感じながら帰路についた。

後期高齢者となると終活をしなければとか、自分の最後に向かっているというネガティブな思考をもちがちであると思う。でも私は生きている限り、感動を求め、新しい出会いを求め、生き生きとポジティブに生活していきたいと思う。せっかく人として生を与えてもらったのだから、限りある時間の中に、大きな感動と喜びを求めていきたいものだ。

भाई मनी सिंह जी: ज्ञान, सेवा और शहादत की अमर गाथा

कीर्ती शर्मा

सिख इतिहास केवल युद्धों और विजयों का इतिहास नहीं है; यह सत्य, सेवा, धर्म-निष्ठा और आत्मबलिदान की महान परंपरा का इतिहास है। इस इतिहास में भाई मनी सिंह जी का नाम अत्यंत श्रद्धा और सम्मान से लिया जाता है। वे केवल एक वीर शहीद ही नहीं, बल्कि विद्वान, गूंथी, लेखक, संगठनकर्ता और पंथ-एकता के महान साधक थे। उनका जीवन यह बताता है कि धर्म की रक्षा केवल तलवार से नहीं, बल्कि ज्ञान, संयम, संगठन और अडिग विश्वास से भी होती है।

भाई मनी सिंह जी का जन्म एक गुरसिख परिवार में हुआ। बचपन से ही उनका संबंध गुरु घर से जुड़ गया था। परंपरा के अनुसार वे गुरु गोबिंद सिंह जी के बाल-सखा रहे और आगे चलकर गुरु साहिब के अत्यंत विश्वसनीय सेवक बने। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के सान्निध्य में न केवल आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की, बल्कि लेखन, गूंथ-सेवा और पंथ-प्रबंधन में भी असाधारण योग्यता दिखाई।

भाई मनी सिंह जी की सबसे बड़ी सेवाओं में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दमदमा साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी के आदेश और मार्गदर्शन में उन्होंने पवित्र बाणी के लेखन और संपादन-कार्य में सेवा निभाई। यह सेवा केवल लिखने का कार्य नहीं था; यह श्रद्धा, शुद्धता और पूर्ण समर्पण का कार्य था। जिस हाथ ने गुरु-वाणी लिखी, वही हाथ आगे चलकर धर्म की रक्षा के लिए कटने को भी तैयार हो गया—यही भाई मनी सिंह जी के जीवन की महानता है।

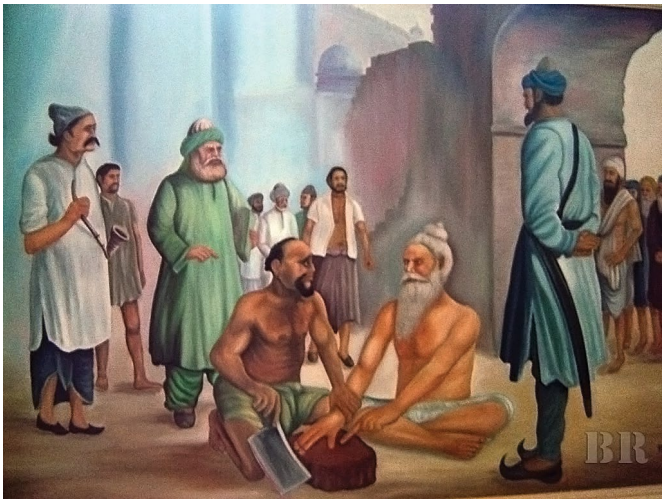
गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद का समय सिख पंथ के लिए अत्यंत कठिन था। मुगल शासन के दमन, आंतरिक मतभेदों और निरंतर संघर्षों के बीच पंथ को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी, जो बुद्धि, धैर्य और धर्म-निष्ठा से सबको साथ रख सके। माता सुंदरी जी ने भाई मनी सिंह जी को श्री हरिमंदिर साहिब, अमृतसर की सेवा और व्यवस्था का दायित्व सौंपा। उन्होंने वहाँ केवल धार्मिक सेवा ही नहीं की, बल्कि पंथ में अनुशासन, एकता और मर्यादा बनाए रखने का काम भी किया।

भाई मनी सिंह जी ने उस समय पंथ के भीतर पैदा हुए मतभेदों को शांत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे जानते थे कि बाहरी शत्रु से लड़ने से पहले आंतरिक एकता आवश्यक है। उनकी वाणी में विद्वत्ता थी, व्यवहार में मिठास थी और निर्णयों में दूरदृष्टि थी। इसी कारण वे सिख समाज में अत्यंत सम्मानित हुए।

उनकी शहादत की कथा सिख इतिहास की अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक घटनाओं में से एक है। उस समय मुगल सरकार सिखों के बड़े धार्मिक समागमों को संदेह और भय की दृष्टि से देखती थी। भाई मनी सिंह जी ने अमृतसर में दिवाली के अवसर पर सिख संगत के एकत्र होने की अनुमति मांगी। अनुमति इस शर्त पर दी गई कि सरकार को बड़ी धनराशि अदा की जाएगी। भाई मनी सिंह जी को आशा थी कि संगत के आने पर चढ़ावे से यह राशि दी जा सकेगी।

किन्तु जब उन्हें यह जानकारी मिली कि शासन की मंशा संगत को सुरक्षित एकत्र होने देने की नहीं, बल्कि उन्हें घेरकर मारने की है, तो उन्होंने तुरंत सिखों को संदेश भेजा कि वे अमृतसर न आएँ। उनके लिए धनराशि से बढ़कर संगत की सुरक्षा और पंथ की रक्षा थी। परिणामस्वरूप समागम नहीं हुआ और धनराशि भी एकत्र न हो सकी।

मुगल शासन ने इसे बहाना बनाया। भाई मनी सिंह जी को गिरफ्तार कर लाहौर ले जाया गया। उनसे कहा गया कि वे इस्लाम स्वीकार कर लें या मृत्यु के लिए तैयार हो जाएँ। भाई मनी सिंह जी ने धर्म परिवर्तन से स्पष्ट इंकार कर दिया। उनके लिए शरीर नश्वर था, पर धर्म और विश्वास अमर थे। अंततः उन्हें



अंग-अंग काटकर शहीद करने का आदेश दिया गया।

कहा जाता है कि जब जल्लाद ने शरीर के किसी बड़े हिस्से से काटना शुरू करना चाहा, तो भाई मनी सिंह जी ने उसे टोका और कहा कि आदेश अंग-अंग काटने का है। यह कथा केवल क्रूरता का वर्णन नहीं करती, बल्कि उस आत्मबल को प्रकट करती है जिसमें पीड़ा पर भी धर्म की मर्यादा भारी पड़ती है। उनका शरीर कटता रहा, पर उनका विश्वास नहीं डिगा। यही कारण है कि उन्हें “बंद-बंद कटवाने वाले शहीद” के रूप में स्मरण किया जाता है।

भाई मनी सिंह जी की शहादत हमें कई संदेश देती है। पहला, धर्म केवल उपदेश का विषय नहीं, बल्कि जीवन की साधना है। दूसरा, नेतृत्व का अर्थ पद नहीं, बल्कि संकट के समय सही निर्णय लेने का साहस है। तीसरा, समाज की रक्षा के लिए कभी-कभी स्वयं को बलिदान करना पड़ता है। चौथा, ज्ञान और वीरता जब एक साथ जुड़ते हैं, तभी समाज में स्थायी प्रेरणा पैदा होती है।

आज के समय में भाई मनी सिंह जी का जीवन और भी प्रासंगिक है। जब समाज में विभाजन, अहंकार और स्वार्थ बढ़ते हैं, तब उनका जीवन हमें पंथ-एकता, सेवा, संयम और मर्यादा का मार्ग दिखाता है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा धार्मिक व्यक्ति केवल पूजा-पाठ करने वाला नहीं होता, बल्कि अन्याय के सामने अडिग खड़ा होने वाला होता है।

भाई मनी सिंह जी की शहादत केवल सिख समाज की धरोहर नहीं, बल्कि सम्पूर्ण भारत की आत्मा का गौरव है। उन्होंने धर्म, संस्कृति और मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए अपना शरीर अर्पित कर दिया। उनकी स्मृति हमें यह प्रेरणा देती है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य भले ही शरीर से पराजित दिखाई दे, पर इतिहास में वही अमर होता है।

भाई मनी सिंह जी का जीवन एक दीपक है—ज्ञान का, सेवा का, साहस का और बलिदान का। उनके कटे हुए अंग आज भी इतिहास से यही पुकारते हैं: धर्म के लिए जीना भी महान है, पर धर्म के लिए अडिग रहकर मरना अमरत्व है।

कविताओं का गुलदस्ता

मनमोहन सिंह साहनी

दोस्ती दुश्मनी

दोस्त मेरे कम है दुश्मनी मैं रखता नहीं
खुद से खुश हूँ किसी को मैं तकता नहीं

नाराज़ रहतें हैं दोस्त मेरी साफ़गोई से
मुंह पर कहता हूँ दिल में मैं रखता नहीं

अपने गिरेबान में झाँक कर देख लेता हूँ
किसी और के गिरने पर मैं हसता नहीं

मुझको इतना सस्ता ना समझ ऐ दोस्त मेरे
हर महफिल में घुँघरू की तरह बजता नहीं

माना सुख के दिन जल्दी बीत जाते है
दुख लंबा होते हुए भी मैं थकता नहीं

हर हाल में ख़ुश रहने की आदत है मेरी
किसी की कामयाबी से मैं जलता नहीं

आदमी और इंसान

चुप चाप ज़िन्दगी जिए जा रहें हैं हम
सब्र का एक घूँट पिए जा रहें है हम

कोई तो होगा दिल को समझने वाला
इस आस पर सब कुछ लुटा रहें हैं हम

जब कोई नहीं सुनता हमारी बात को
तब ख़ुद को ही सुनाए जा रहें हैं हम

आदमियों की इस बेहिसाब भीड़ में
इक इंसान नहीं ढूंड पा रहें है हम

दुनिया की मतलब परस्ती देख कर
अपने आप में सिमटते जा रहें है हम

जिस खुदा ने बेशुमार नेमतें दी हमें
उसी से गिला किए जा रहें हैं हम

नया साल

नया साल बदलने से हालात नहीं बदलते
ग़ुरबत में फसे हुओं के दिनरात नहीं बदलते

बदनीयत कभी अपनी आदत नहीं बदलते

ज़िंदगी क्या है गरीबों से पूछ कर देखो
जिनके रोज़ीरोटी के सवालात नहीं बदलते

पुरानी और नयी पीढ़ी में बस यही फर्क है
एक बार वचन देकर वो बात नहीं बदलते

अंधभक्तों की भक्ति को सलाम है
चाहे जो भी हो वो ख़यालात नहीं बदलते

बच्चों की बेरुख़ी और तानो के बाद भी
माँ बाप के उनके लिए जज़्बात नहीं बदलते

तारीख़ सिर्फ़ कैलेंडर में बदलती है

वफादारी क्या है ये परिंदों से सीखें
जो मरने तक अपनी शाख़ नहीं बदलते

समय का फेर

पल पल ज़िंदगी निकलती जा रही है
जैसे हाथ से रेत फिसलती जा रही है

कमल की खुशबू चमन में महकती जा रही है

मैं तो जैसा पहला था वैसे ही अब हूँ
हाला कि दुनिया बदलती जा रही हैं

खुदा की तलाश में बाबाओं के डेरों पर
कर्मकांडों में दुनिया भटकती जा रही है

सीने की जलन को दबा कर भी देखा
पर ये आग है कि सुलगती जा रही है

अपने काम में मगन ख़ुशी हो या ग़म
चिड़िया अपनी धुन में चहकती जा रही है

कीचड़ की बदबू के साथ रहते हुए भी

दराज़-ए-सफ़र

त्रीभूवन खन्डेलवाल

कभी कभी मोहब्बत की पेचीदा राहों में
एक ऐसा मोड़ भी आता है,
जहाँ हर मोड़ पर वफा का इम्तिहान होता है।
दूरियाँ सामने बुलंद दीवार बनकर
इस काँच के दिल को हिला देती हैं।
फिर, दिमाग़ कहता है 'सब भूल जाओ',
ज़माना कहता है 'थम जाओ',
पर यह आवारा दिल कहता है...
'चलते जाओ उस हमसफ़र की ओर,
जिसकी आँखों में तुम्हारी दुनिया है।'
और यक़ीन करो,
आज़माइश के उस दौर में किया वादा
कल की सबसे हसीन दिल्लगी बन जाता है।
क्योंकि, हिज्र की रातों के बाद ही तो
वस्ल की सुबह का सुकून हासिल होता है।

नज़र-ए-इश्क़ का बयान

त्रीभूवन खन्डेलवाल

हर दिल ने मोहब्बत की राहों में एक बार
इन आँखों को छलकते ज़रूर देखा होगा।
कभी तन्हाई में बही होंगी, कभी चाहत में भीगी होंगी,
पर हर बूँद में सिर्फ़ एक ही हक़ीक़त छुपी है।

या तो सनम की जुदाई ने तड़पाया होगा,
किसी अनकहे दर्द ने दिल को पुकारा होगा,
या फिर महबूब के दीदार की ख़ुशी ने दस्तक़ दी होगी,
और इन निगाहों ने झूमकर उनका इस्तक़बाल किया होगा।

अश्क़ बहना तो बस इस दीवाने दिल की एक रस्म है,
असल बात तो यह है कि यह अश्क़ किस नाम से बहे हैं।
वजह ही तय करती है कि यह ज़ख़्म-ए-दिल है या मरहम,
वजह ही बताती है कि यह आँसू कोई कसक हैं या इश्क़ का जश्न।

अगर यह नदामत और जुदाई के दर्द में छलकी हैं,
तो जान लो, इस हिज्र की रात में ख़ुद ही को थामना होगा।

शायद कोई मसीहा आ जाए, कोई अपना कंधा दे दे,
पर इस इश्क़ की आग से उभरना तो ख़ुद ही पड़ेगा,
ज़िंदगी की इस राह पर फिर से चलना तो ख़ुद ही पड़ेगा।

और, अगर यह रंग-ए-इश्क़ और नशा-ए-वस्ल की ख़ुशी में नम हुई हैं,
तो समझ लेना कि यह हसीन लम्हे पानी के बुलबुले की तरह हैं,
बस चंद पलों के मुसाफ़िर हैं, जो दिल को भिगोकर गुज़र जाएँगे।

तो बेझिझक रो लेना जब दिल पर सनम की यादों का बोझ हो,
और खुलकर मुस्कुरा लेना जब उनकी एक झलक से मन हल्का हो जाए,
क्योंकि यह निगाहें कभी झूठ नहीं बोलतीं,
यह तो बस दिल-ए-नादाँ का हाल हू-ब-हू बयाँ कर देती हैं।

योग भगाये रोग

शांगरीला

“आज समय नहीं है, रिपोर्ट भेजनी है।” “अभी तो खाना खा लिया, बाद में करेंगे।” “अब इस उम्र में कहाँ झुका जाता है।” बस इसी तरह के बहाने बनाते हुए कब रोग शरीर को जकड़ लेता है। कब जोड़ों में बेहिसाब दर्द और जकड़न रहने लगती है कि पता ही नहीं चलता। ना जाने कब हमें छोटी-छोटी बातों के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ सकता है। हालाँकि, हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम कितना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी समय रहते अपने इस शरीर को समय नहीं देते हैं। निरोगी काया कोई लक्ज़री नहीं है बल्कि बढ़ती उम्र में भी स्वतंत्र जीवन जीने के लिए मज़बूत आधार है। जीवन की भागदौड़ तो शायद ही कभी थमे, लेकिन जीवन की गति थमे उससे पहले चेत जाना चाहिए और खुद के लिए दिन में कम से कम कुछ पल ज़रूर निकालना चाहिए।





वर्ष 2026 के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की आधिकारिक थीम भी **"योग फ़ॉर हेल्दी एजिंग"** यानि स्वस्थ आयु के लिए योग / स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग है। आज पूरी दुनिया योग के महत्व को समझ रही है लेकिन हम भारतीय ही अपनी इस प्राचीन विरासत से विमुख हो रहे हैं। योग एक ऐसा अभ्यास है जो जीवन के किसी भी पड़ाव पर अपनाया जा सकता है। इसके लिए ना ढेर सारे उपकरण चाहिए और ना ही कोई महँगी जिम मेम्बरशिप।

हर दिन सिर्फ़ आधा घंटा योग करने से शुरुआत करें और यकीनन आपको अनेक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ दिखाई देने लगेंगे। शुरू में देर तक अभ्यास की बजाये नियमित दैनिक अभ्यास को अपनी जीवन शैली बनायें। नियमित अभ्यास ही कालंतर में शारीरिक शक्ति और मानसिक शांति प्रदान करेगा।

योग के फ़ायदों से शायद सभी परिचित भी होंगे। लेकिन एकबार दुहरा देने और उन्हें दुबारा याद करने में कोई हर्ज़ नहीं है। सबसे पहले तो योग शरीर में लचिलापन बढ़ाता है। कहते हैं आपकी रीढ़ जितनी ज़्यादा लचीली उतनी लम्बी आयु। विभिन्न आसनों में अपना खुद का वज़न उठाने से माँसपेशियाँ मज़बूत होती हैं। आपको जिम जाकर वज़न उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। योग शरीर और मन में स्थिरता और संतुलन लाता है। कई तरह के रोगों में योग से आराम मिलता है। प्राणायाम और आसन मानसिक तनाव भगाते हैं जिससे अनेक रोग भी दूर ही रहते हैं। शारीरिक क्षमता बढ़ने के साथ ही एकाग्रता भी बढ़ती है जो अंततः हमारी कार्य कुशलता बेहतर बनाती है।

योग पर हुए विभिन्न अध्ययनों से वैज्ञानिक स्तर पर उसके लाभ देखे गए हैं। सभी लाभ यहाँ लिखने लगी तो एक ग्रंथ बन जाएगा। लेकिन, एक छोटा से उदहरण है भ्रामरी प्राणायाम का जिसे आज सुपर ब्रेन ब्रीथिंग कहा जाता है। इसे करने से नासिका में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है जो शरीर का पैरासिम्पेथैटिक नर्वस सिस्टम को जागृत करता है और तनाव घटाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी नसों को लचीला बनाने में मददगार है।

खैर, अंत में सिर्फ़ यही कहना चाहूँगी कि जब योग अपनायें तो किसी अच्छे प्रशिक्षित योगाचार्य के सानिध्य में योग करें और आजीवन स्वस्थ रहें और खुश रहें।



"Durga"
by Bhaswati Ghosh



"Goddess Durga"
by Subho Sarkar



"Eternal Peace"
by Anirban Bhattacharya



"Apples In A Bowl"
by Sanchita Ghosh



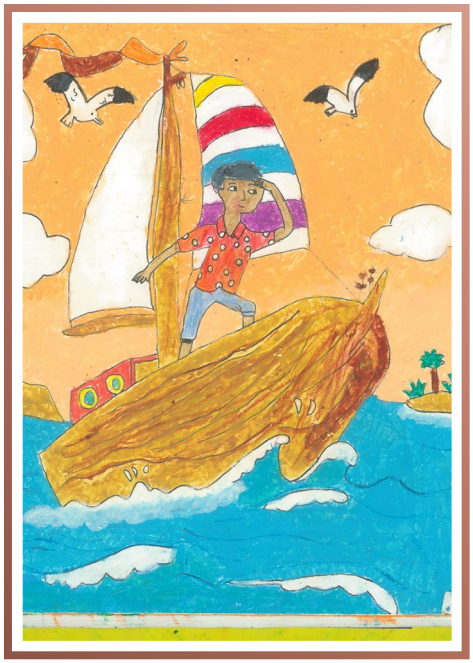
"A Mother's Love, An Artist's Soul"
by Sukrishna Ishii



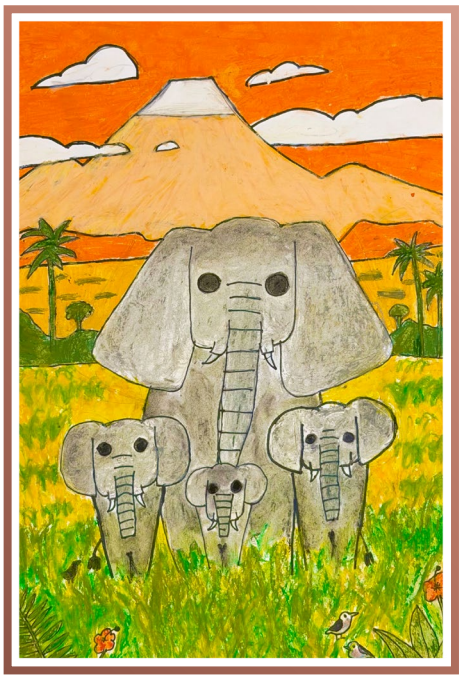
"Mother's Love"
by Sushmita Pal



"Prowl In The Ripples"
by Advika Ghosh, 14 years



"Little Captain, Big Adventure"
by Kiaan Ghosh, 10 years



"Love Leads The Herd"
by Aaditya Das, 8 years



"Doggy - Azure"
by Aaditri De, 12 years



"Nature With Temple"
by Aditya Shankar-12 Years 10 months



"Connection"
by Sasha Kar, 11 years



"Rare Duck"
by Zinniya Maya Dhar, 17 years



"Blue Sand Art"
by Neal Ghosh Sharma, 5 years



"Million reasons to blend in, One reason to stand out !"

by Moitrayee Majumder



"The Smallest Lake, The Grandest View : Lake Shoji"

by Purbita Datta



"Turquoise dreams framed by endless green"

by Krishana Das



"Convergence: Nature, engineering, and perspective aligned."

by Mayukh Datta



"Still Waters, Sun-kissed Feathers"

by Ashmita Paul



"The 300kmph Pursuit at Fuji Speedway"

by Ashoke Karmokar

BENGALI ASSOCIATION OF TOKYO, JAPAN (BATJ)
(IPPAN SADAN HOUJIN INDOJIN NO TSUDOI)

ACCOUNT STATEMENT FOR JANUARY 01, 2025 TO DECEMBER 31, 2025
(AS PER TAX RETURN OF FY 2025)

1. Opening balances on January 01, 2025	¥1,617,635
(a) In bank account - ¥427,804	
(b) Cash in hand - ¥1,189,831	
1. Closing balances on December 31, 2025	¥1,203,094
(a) In bank account - ¥848,504	
(b) Cash in hand - ¥354,590	

SINCERE THANKS FROM
BENGALI ASSOCIATION OF TOKYO, JAPAN (BATJ)
FOR DONATIONS ON

Donations for Durga Puja on September 28th, 2025

1. Anirvan & Srabani Mukherjee: Puja Misc items
2. Pranesh & Chandrima Kundu- Puja Bhog & Gojas
3. Biswanath & Chaitali Paul: Dry Fruits & Nuts
4. Krishana & Moitrayee Das: Fresh Grapes
5. Ranjan & Abantika Das: Fresh Fruits & Peras
6. Kalaswan & Anindita Dutta: Motichoor Laddus
7. Lakshman & Sophiya Hazra : Coconut Barfis
8. Snehashish & Joyita Dutta- Fresh Oranges
9. Abhishek & Priyanka Ghosh: Nimkis
10. Prabir & Tuli Patra: Flowers
11. Sunil Viswanathan & Sangeetha Krishnamoorthy: Flowers
12. Hemlatha Anand & Family: Flowers
13. Mayukh & Purbita Datta: Mini Samosas and Kochuris

Donations for Saraswati Puja on February 9th, 2025

1. Anirvan & Srabani Mukherjee: Puja Bhog & Misc Items
2. Biswanath & Chaitali Paul: Dry Fruits
3. Krishana & Moitrayee Das: Fresh Fruits
4. Ranjan & Abantika Das: Fresh Fruits & Peras
5. Partha & Lia Kumar: Boondi Laddus
6. Ashoke & Aparna Karmokar: Chocolates
7. Pranesh & Chandrima Kundu: Kheer Mohan
8. Sunil Viswanathan & Sangeetha Krishnamoorthy: Flowers

Acknowledgement

We are pleased to present the 2026 edition of Anjali with our deepest appreciation and sincere gratitude to everyone whose support, contribution, and goodwill have made this publication possible.

The continued growth and evolution of Anjali are a reflection of the unwavering dedication and generous support of our esteemed patrons and well-wishers. Their enduring encouragement lends each edition both vitality and purpose, enabling us to celebrate the richness and diversity of cultural expression. Each volume is, in its own way, a tapestry of voices and perspectives, brought together through the universal language of art, thought, and creativity.

We extend our heartfelt gratitude to all our contributors for entrusting us with their work. We are particularly grateful to our international contributors, whose diverse perspectives and cross-cultural contributions have enriched the publication and extended the reach and resonance of Anjali beyond geographical boundaries.

Our sincere appreciation also goes to our longstanding sponsors and advertisers for their continued patronage. Their invaluable support has played an essential role in sustaining the publication of Anjali, and we are delighted to see our digital readership continue to grow steadily and meaningfully.

We are equally indebted to the many individuals whose guidance, thoughtful counsel, and scholarly insight have helped shape the character, quality, and integrity of this publication.

To everyone who has supported, contributed to, and accompanied Anjali on its journey, we offer our deepest thanks and enduring appreciation.

Editorial Team

Biswanath Paul
Joyita Basu Dutta
Moitrayee Majumder
Krishana Das
Chaitali Paul
Purbita Datta
Mayukh Datta

Cover Artwork

Mimi Dhar

Collage

Moitrayee Majumder

Magazine Design

Mayukh Datta

NIPPON VEDANTA SOCIETY

Ramkrishna Mission in Japan

This mission is represented by

Swami Medhasananda and is located at

NIPPON VEDANTA SOCIETY
4-18-1 Hisagi, Zushi-shi,
Kanagawa-ken 249-0001

Phone: +81-46-873-0428 Fax: +81-46-873-0592
Website: http://www.vedanta.jp Email: info@vedanta.jp

Best Wishes From



Rokko Sarees & Fabrics Co., Ltd.

Famous for Japanese and Indian Sarees and Fabrics

Batra Insurance

Agents for THE NEW INDIA ASSURANCE CO. LTD.

Since 1972

Comprehensive Fire, Comprehensive Automobile, Personal and Public Liability, Overseas Travel Personal Accident Insurance and Reverse OTPA for Short Term Medical Insurance needs for your relatives visiting Japan.

Tokyo Office (JR Ebisu St. East Exit)
Pine Crest 1Fl., 1-7-3, Hiro-o,
Shibuya-ku, Tokyo. 150-0012
Tel.: 03-3400-6887 Fax: 03-3400-6889
Mobile: 090-9848-4373

e-mail: rokko_sarees@f02.itscom.net
batra-insurance@f02.itscom.net

日本で一番インドに近いインドレストラン®

Indian Restaurant Mumbai

mumbaijapan.com



A Happy Durga Pooja to All!

Sweeten Your Celebrations
with Our Irresistible
Mithai Selection

⇒ Order here!



শারদ শুভেচ্ছায়

Priya

The Indian Restaurant

インド料理プリヤ

5-2-25 Hiroo Hongoku Building 3rd Floor Shibuya-ku Tokyo 150-0012
東京都渋谷区広尾5-2-25本国ビル3F 〒150-0012

priyajapan.com
☎ 03-5941-6996



May Maa Durga's Blessings Bring Peace and Harmony to All

- A well wisher

Carica Celapi

Carica is a powerful and delicious food supplement made of fermented papaya. Papaya has been called "golden tree of life" and has been a favourite substance from ancient times. Carica is produced from papaya by excellent world renowned Japanese fermentation technology.

Carica Celapi PS501 is made from unripened papayas which have been selected carefully. After taking the skin, seed and juice from the fruit without oxidation, they are fermented and ripened, then dried naturally. There is no process of extracting just one component or chemical treatment. Also there are no additives such as vitamins or calcium. The manufacturing process is natural and holistic.

a. "Carica Celapi PS-501", 100 sachets (3grams each) 27,000 yen
b. "Carica Celapi PS-501", 40 sachets (3grams each) 12,960 yen

For more information or order

0120-65-8631 (free call)

Free catalogs (in Japanese) is available

Ayurveda, Jyotish, Gandharva-veda, Amrit Kalash

Amrit, Inc. (有限会社アムリット)
〒510-0815 三重県四日市市野田1－2－23
TEL 059-340-5139 FAX 059-340-5175
E-mail: info@amrit.jp
URL: http://www.amrit.jp

アーユルヴェーダ
インド占星術
太古インド音楽
ヴェーダ天文台

Amrit, Ghee, Incenses,
Aroma oils, Herbal teas, Spices,
Ancient Indian Music CD, Books,
Indian Astrology, Ayurveda,
本物研究所代理店

STATE BANK OF INDIA

We offer following services:

- Fixed deposits in USD & JPY at attractive rates.
- Remittance facilities to Individuals / Corporates / Institutional accounts with competitive Exchange rates for remittances in USD & INR
- Opening of current accounts in Japan.
- NRE/NRO account related service.

Remittances To India

- SBI Tokyo provides remittance services in six currencies i.e. INR, USD, GBP, EURO, JPY and Nepali Rupee at attractive exchange rates.
- Remittance services can be availed by account holders as well as walk-in customers.

ADDRESS

Tokyo Branch

Tokyo Tatemono Nihonbashi Building
4th Floor, 1-3-13 Nihonbashi
Chuo-ku, Tokyo
(B9-Exit @ Nihonbashi Station)

CONTACT DETAILS

E-mail: rem.tokyo@statebank.com
avprem.tokyo@statebank.com
Phone: 03-3517-3720/03-3517-3711

State Bank of India

With Best Wishes

Bank of India

Relationship beyond banking

Please contact us for:

1) Remittance Services	**2) Deposit Services**
3) Trade-related Services	**4) Foreign Exchange**



Tokyo	Osaka
Marunouchi Nakadori Bldg. 2-2-3, Marunouchi Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 Phone: 03-3212-0911 e-mail: boitok@gol.com	OAK Sakaisuji Honmachi Bldg. 1-8-12, Honmachi Chuo-ku, Osaka 541-0053 Phone: 06-6261-4035 e-mail: boi.osaka@bankofindia.co.in

Please visit us at https://www.boijapan.com



WISHING ALL
A VERY JOYOUS
DURGA PUJA

- Amitava

From
Amitava Ghosh
(080 3177 6563)

HAPPY BIJOYA

DIYA

INDIAN RESTAURANT

NEW BRANCH OPEN

Bringing you flavours from South and North India

NeWoman, Takanawa Gateway City,

Connected to Takanawa Gateway Station

Private Rooms Available

NEWoMan TAKANAWA, South Bldg. 4F : 03-5422-6861
2-12-2 Takanawa, Tokyo

Other Branches:

Roppongi Hills Hillside B1 03-6438-1177
6-10-1 Roppongi, Tokyo

Tokyo Hibiya Midtown 2F 03-6550-8765
1-1-2 Yurakucho, Tokyo

Heartiest Puja Greetings



Reasonably Priced Quality Food

適正価格で最高の料理

インド料理
シャグン
Shaghun
Indian Restaurant

Contact Information:

Address: 1-18-12 Mizonokuchi
Takatsu-ku,Kawasaki-shi,
Kanagawa 213-0001 Japan

〒213-0001
神奈川県、川崎市、高津区、溝の口1-18-12
www.shaghun.jp
e-mail:shaghunjp@gmail.com
Phone/Fax: 044-813-0102



LUNCH BUFFET
(ALL BRANCHES)

AWARDED BEST RESTAURANT IN JAPAN FOR 6 YEARS CONSECUTIVELY.

Make any occassion special with our large scale booking - Birthday, Marriage, Anniversary, Festivals and more. Ladies Day, every Tuesday. Free Lassi/Mango Lassi for Ladies.

Akasaka
3F, 2-14-31
Wind Akasaka Building
Akasaka,
Minato-ku,
Tokyo 107-0052
Phone: 03-5797-7786

Ariake
3F, TOC Ariake Building
Ariake 3-5-7,
Koto-ku,
Tokyo 135-0063
Phone: 03-6426-0651

Kamiyacho
2F, Oote Building
Toronomon 3-19-7,
Minato-ku,
Tokyo 105-0001
Phone: 03-3433-1217

Toranomon
B1F Toranomon
Jitsugyo Kaikan
Toranomon 1-1-20,
Minato-ku,
Tokyo 105-0001
Phone: 03-5510-7875

Nirvanam Ginza
Ginza 2-4-6,
Velvia-kan 7F,
Chuo-ku,
Tokyo 104-0061
Phone: 03-6271-0957

Atago
Nirvanam Atago Hills
3F Atago Green Hills,
2-5-1, Atago,
Minato-ku,
Tokyo 105-6203
Phone: 03-6403-0710

Tokyo Big Sight
2F, TFT Building
East Tower,
3-6-11 Ariake,
Koto-ku,
Tokyo 135-0063
Phone: 03-3599-5317

20% OFF

nirvanam
SPECIAL DINNER DISCOUNT COUPON

- Present this coupon at any of our branches to avail the offer
- Cash payments only
- Not valid with any other offer/coupon
- 20% OFF per bill.
- To avail this offer, reservation is required.
- No reservations for *Lunch*.
- Valid Up to : Dec 31, 2026

Heartiest Felicitations on Durga Puja Celebration

PURE RATNAGIRI ALPHONSO MANGO



ALPHONSO MANGO PULP · SLICE · JUICE

100% PURE ALPHONSO MANGO

- マンゴーパルプ（缶）
- スライス（缶）
- ジュース（ビン入）

3689 FPO PRODUCT OF INDIA

MANUFACTURED BY DESAI BROTHER'S PAWAS CANNING PAWAS DIST RATNAGIRI (INDIA)



Melghat Hunting Honey



INDIAN WILD BLACK HONEY
– THE GIFT OF THE FOREST –

This rare black honey,
harvested from the deep forests of India,
is collected by wild bees from plants
within a protected natural reserve.
Rich in antioxidants, minerals, and enzymes,
it offers more than sweetness
—supporting immunity, digestion, and overall vitality.

With its bold earthy taste and herbal notes,
this 100% pure honey delivers
the true spirit of the wild in every drop.



sole Distributor of VIJAY ALPHONSO MANGO Products in Japan

SITAR Ltd.

Online Shopping　Home

Indian Restaurant SITAR



TEL 043-272-7050　FAX 043-272-7075
https://sitar.co.jp/　https://www.e-sitar.jp/　info2@sitar.co.jp
1-106-16, Kemigawa-cho, Hanamigawa-ku, Chiba 262-0023

SARTAJ

Taste The Real Origin

since 2006

Importer & Distributor of Indian Spices and Grocery



Bringing best of Indian Brands to Japan













Shop Online in Categories of:

• Spices • Beans • Pulp & Juices • Herbs • Dry Leaves • Non-Food
• Oil & Ghee • Atta • Rice • Dry Fruits • Chutneys • Alcohol
• Ready-to-Eat • Snacks & Biscuits • Pickles • RTC • Frozen
• Cosmetics • Healthcare • Superfood • General

Easy-to-shop Online | **Nation-wide Delivery** | **Great Weekly Deals**

HI-QUALITY ASSURED

- All our products are 100% Veg and suitable for vegetarians.
- Vegan products are also available online at Sartaj Foods.
- Also shop variety of cosmetics, beauty, & health products.
- We offer fast and secure delivery to all the regions of Japan.

〒563-0043 Osaka-fu, Ikeda-shi, Kouda 2-10-23 • Tel: 072-751-1975 • Fax: 072-751-1976

www.sartajfoods.jp • email: info@sartajfoods.jp

online store
BATICROM FOODS
An Enterprise of Diamond Trading Ltd.

Japan's Trusted Halal Store Since 1992

For more than 30 years, BATICROM FOODS has proudly served Japan with premium Halal-certified products. We specialize in importing quality frozen fish, fresh vegetables, daily essentials, and also produce some of the finest traditional sweets in Japan.



Our Tokyo store and online shop serve a diverse community—shops, restaurants,and families who trust us for quality and service. With 24/7 online orders and friendly in-store support, we ensure a smooth and reliable shopping experience.

CONTACT US

115-004, Tokyo, Kita Ku, Akabane Minami 2-16-11, Diamond Building. (Near JR Akabane Station)
Tel: 03-3902-1442, 03-6682-8323. Mobile: 090-3913-4440 (Line, Whatsapp, Viber). Fax: 03-6680-2179.

www.baticrom.com

online store BATICROM
An Enterprise of Diamond Trading Ltd
SINCE 1992

Enterprise of Diamond Trading Ltd.

BATICROM AUTO
BUSINESS ON WHEELS

With Best Wishes From :

Indo Bazaar

A Complete Shopping Center

Authentic Indian Groceries Delivered Across Japan

Customer Care
090-6043-7125

Contact
Email: indobazaarjapan@gmail.com
Website : http://www.indobazaar.com

Kamata shop:
144-0052, Kamata, Ota-Ku, Tokyo 5-20-6

Indian Restaurant: Lucknow Café
Pacific Palace B1F, Miyamoto-Cho, Kawasaki-Ku
Kawasaki-Shi , Kanagawa
Tel: 044-589-5201

New Open

Indobazaar Sakuragicho
231-0064 Kanagawa , Yokohama, Naka Ward, Nogecho
3 Chome-160-4, Cheru , Noge , 1F



Celebrate the spirit of

DURGA PUJA

with faith, happiness, and togetherness.

Ambika

BRINGING INDIA CLOSER

ENJOY 10% OFF

ON YOUR PURCHASE FROM THE AMBIKA VEG & VEGAN ONLINE STORE.

USE CODE: FEST10

Festive Offer | Valid till 31st October | Cannot be combined with any other offers.



Ambika VEG & VEGAN SHOP

SINCE 1998 IN JAPAN

Marketed in Japan by Ambika Corporation

AYUR YOGA
アーユルヴェーダ・ヨガ・瞑想

www.ambikajapan.com

KNOW MORE

Sharodiya Greetings

Warm wishes on the auspicious occasion of Durga Puja

ORYXPEER CO., LTD.

Bridging Technology, Talent & Global Opportunities

A forward-looking Japan-based consulting and technology partner delivering intelligent business solutions across industries.



Our Core Expertise

- Technology Consulting
- IT Staffing & Recruitment
- SAP & Enterprise Solutions
- Pharma Safety & Regulatory Systems
- Cybersecurity & Digital Transformation
- Automotive Engineering, Mobility & Innovation
- Robotics, AI & Generative AI
- Career Building: Non-Technical to Technical Transition



With best wishes to the Indian community in Japan and to all communities celebrating this festive season.

info@oryxpeer.com

Tokyo, Japan

दि न्यू इंन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड

The New India Assurance Co. Ltd.

Japan Regional Office - 22F, STEC Joho Bldg.
1-24-1, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-Ku, Tokyo 160-0023

76 YEARS OF JAPAN OPERATIONS

OUR PRODUCTS

- Fire Insurance
- Householders Insurance
- Shopkeepers Insurance
- Earthquake Insurance
- Vehicle Insurance
- Movable All Risks Insurance
- Personal Accident Insurance
- Overseas Travel PA Insurance
- Liability Insurance
- Marine Cargo

AN INDIAN MULTI-NATIONAL since 1919 • presence in 24 countries

Your reliable insurer in Japan since 1950

Ensuring lasting customer relationships

RESOURCE PERSONS FOR RELATIONSHIP

Mr. P. S. Amos Victor
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
☎ 080-8191-6899

Mr. Shafique Ahmad
DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER
☎ 080-7745-4822

Branches: Tokyo • Osaka • Nagoya • Hiroshima • Sapporo • Okayama • Gifu

Sub Branches: Fukuyama • Iwakuni • Shimonoseki • Himeji

Please visit us at www.newindia.co.jp

KOHANA
INTERNATIONAL SCHOOL
PASSION • CREATIVITY • VALUES

ADMISSIONS OPEN



One of the **BEST** and **MOST AFFORDABLE** **CAMBRIDGE SCHOOLS** in **JAPAN**







KAWASAKI CAMPUS

- PRESCHOOL
- GRADE 8
- CAMBRIDGE IGCSE AND A LEVELS (GRADE 9 - 12)

TSURUMI CAMPUS

- GRADE 1 - 7

SCHOOL FACILITIES

- SCHOOL LIBRARY
- SCHOOL BUS AND BENTO SERVICES
- ACTIVITY AREA
- SCIENCE LABORATORY
- WELLNESS ROOM
- FUJITSU STADIUM AND MEGALOS SPORTS COMPLEX FOR SPORTS ACTIVITIES
- INTERACTIVE SMART PANEL IN EACH CLASS
- IXL LEARNING MANAGEMENT SYSTEM
- SPECIALLY DESIGNED PHONICS PROGRAMME

CAMBRIDGE TRAINED AND EXPERIENCED TEACHERS

ENGLISH AND JAPANESE LANGUAGE SUPPORT AVAILABLE

EXTENDED & AFTER SCHOOL PROGRAMS

UNIVERSITY AND COLLEGE PLACEMENT COUNSELLING

E-DIGITAL LIBRARY

CAMBRIDGE International Education
Cambridge International School

IPC Franchisee

TaiP

UCAS Universities and Colleges Admissions Services

BridgeU

DE THE DUKE OF EDINBURGH'S AWARD







BOOK A SPACE NOW!

FOR MORE DETAILS:

Phone
045-642-8628 (TSURUMI)
044-276-9494 (KAWASAKI)
+81 90 9972 0737

Mail
office@kohanainternationalschool.com

Website www.kohanainternationalschool.com







TokyoMithaiWala

Handcrafting Sweet Traditions since 2019.

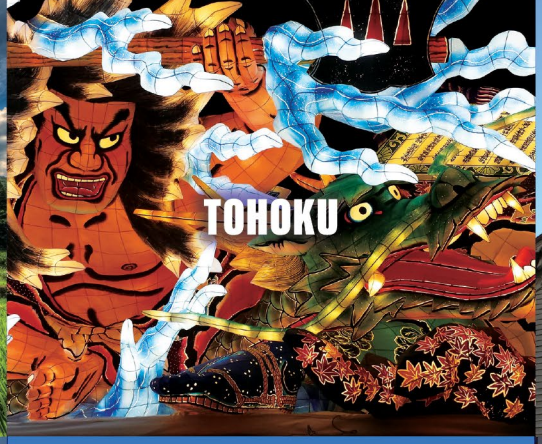
www.tokyomithaiwala.jp

03-6808-0777

visit our website

SEINAN GROUP









HMI HOTEL GROUP

2025 - 2027
GRAND OPENING 7 HOTELS

MARRIOTT

HAMAMATSU, KYOTO, KOBE (2)
KITAKYUSHU, KOKURA, OKINAWA





2026
GRAND OPENING 3 HOTELS

ANA CROWNE PLAZA®
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP

HAMAMATSU, CHIRYU, KOCHI









IN 22 PREFECTURES IN JAPAN, HMI HOTEL GROUP OPERATES 41 HOTELS

HOKKAIDO	Hotel Pearl City Sapporo
TOHOKU	Hotel Pearl City Hachinohe, Hotel Pearl City Akita Kawabata, Hotel Pearl City Akita Kanto Odori, Hotel Pearl City Morioka, Hotel Pearl City Kesennuma, Hotel Kameya, Hotel Pearl City Tendo, Hotel Pearl City Sendai
KANTO	Ginza Creston, Shibuya Creston Hotel, Chofu Creston Hotel, Mikazuki sea park hotel Katsuura, Mikazuki sea park hotel Awa Kamogawa, Hotel Nankaiso
TOKAI	Hotel Ravie Kawaryo, Daisenya, Tsumagoi Resort Sai no Sato, ANA Crowne Plaza Hotel Hamamatsu, Hamamatsu Marriott Hotel, Mikawa Bay hills Hotel, Irago Resort & Convention Hotel, ANA Crowne Plaza Hotel Chiryu
HOKURIKU	Hotel Wellness Notoji
KANSAI	Hotel Heian no Mori Kyoto, Kobe Marriott Hotel, Hotel Pearl City Kobe
CHUGOKU	Misasa Royal Hotel, Hoseikan, Ryotei Yamanoi, Yumoto Kanko Hotel Saikyo
SHIKOKU	ANA Crowne Plaza Hotel Kochi
KYUSHU	Hotel Crown Palais Kitakyushu, Hotel Crown Palais Kokura, Yatsushiro Grand Hotel, Nagasaki Nisshokan, Nisshokan Shinkan Baishokaku, Nisshokan Bettei Koyotei, Hotel Kirishima Castle
OKINAWA	Rizzan Sea-Park Hotel Tancha-Bay, Motobu Green-Park Hotel

Seles Office:

Tokyo	TEL 03-5623-3008	FAX 03-5614-0376	Sendai	TEL 022-267-0821	FAX 022-262-8720
Nagoya	TEL 052-264-7671	FAX 052-249-3637	Osaka	TEL 06-6210-4145	FAX 06-6210-4146
Fukuoka	TEL 092-483-3811	FAX 092-483-3821			

HMI
HOTEL GROUP
https://hmihotelgroup.com